গ্রহণ করিয়া ইনি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শান্তিদাতা ঈশ্বর ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন।

লর্ড কর্জ্জনের উপাধি—লর্ড কর্জ্জন অনেকগুলি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার নাম আর্ল কার্জ্জন অব্ কেড্‌লেষ্টন, ভাই কাউণ্ট স্কার্সডেল এবং ব্যারন ব্র্যাডেন্‌স্‌ডেল হইয়াছে।

একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন—আগামী বড় দিনের ছুটীর সময় কলিকাতায় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন হইবে। আঙ্গলোরের প্রাচীন ব্রাহ্ম মিঃ উল্লাল রঘুনাথায় তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সন্তানে পিতামাতার দোষ গুণ—আমেরিকার নিউ অর্লিন্স নগরে জীবন-বীমা কোম্পানীসমূহের ডাক্তারগণের এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে পিতা মাতার রোগ এবং দোষগুণ সন্তানে সংক্রামিত হয় কিনা, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, পিতা মাতার স্বাস্থ্য অনুসারে সন্তানের স্বাস্থ্য ও জীবন-কাল নির্ণীত হয় এবং বহুমূত্র, বাত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ সংক্রামিত হয়। দোষ গুণ সংক্রামণ সম্বন্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেনঃ—(১) সন্তান পিতামাতার প্রত্যেক দোষ গুণ প্রাপ্ত হয়। (২) পিতামাতার পরস্পর বিপরীত দোষগুণ সন্তান প্রাপ্ত হয় না। (৩) পিতা ও মাতার মধ্যে একজনের দোষগুণ সন্তানে সংক্রামিত হইতে পারে। (৪) সন্তান পিতার কোন কোন গুণ ও মাতার কোন কোন গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে। (৫) কতক বয়স পর্য্যন্ত পিতার ও কতক বয়স পর্য্যন্ত মাতার গুণ সন্তানে দৃষ্ট হয়। (৬) মাতার কোন কোন গুণ সন্তানে প্রবল হইয়া অন্য গুণ সকল ঢাকিয়া রাখিতে পারে। (৭) পিতা মাতা উভয়েতে যে সকল গুণ দেখা যায়, সন্তানে সেই সকল গুণ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। (৮) পিতামাতার দোষ গুণ সন্তানে লুক্কায়িতভাবে থাকিতে পারে, কিন্তু তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ পুরুষে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। (৯) পিতামাতার যে বয়সে যে দোষ গুণ জন্মিয়াছিল, সন্তানেরও সেই বয়সে তাহা দেখা যায়। (১০) পিতার দোষ গুণ পুত্রে ও মাতার দোষ গুণ কন্যাতেই সংক্রামিত হয়।

শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিগত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার মধুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে হৃদ্‌রোগে (Heart fail হইয়া) তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি স্বর্গগত পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের প্রিয় শিষ্য ও সহচর ছিলেন। তাঁহার নিকটেই তিনি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য উৎসাহিত হন। মহর্ষিদেব তাঁহার স্বরচিত আত্মজীবনীর স্বত্ব ইঁহাকেই প্রদান করেন। এই আত্ম-

জীবনীর পরিশিষ্টাংশ সঙ্কলন করিয়া তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হন। প্রিয় শিষ্য এক্ষণে আপন গুরুদেবের নিকট গমন করিলেন, ইহাতে তাঁহার কি অপার আনন্দ! উপনিষদে ইঁহার কি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল! ইনি যখন উপনিষদের শ্লোক পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে যে সুধাধারা বর্ষণ হইত, তাহা ভুলিবার নহে। ইনি বামাবোধিনীর পরমহিতৈষী বন্ধু ছিলেন। যে বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহাকে এই ভূলোকেই ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য এইরূপ গুরু প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার দ্যুলোকের সহায় ও সম্বল। ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন, আমাদের এই প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বঙ্গ যুবকের তুলনায় বঙ্গবালার বিদ্যা ও জ্ঞানশিক্ষা অতি ধীরে ধীরে সাধিত হইতেছে। এই জন্য অনেকে আমাদের সামাজিক অসুবিধাই উহার কারণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

তবে নারীহিতৈষী পুরুষদিগের এত যত্ন কতকটা বিফল হইবার কারণ এই যে, উহা আমাদের নিজেদের মধ্য হইতে উৎপন্ন না হইয়া, বাহির হইতে আসিতেছে। কাজেই নারীজীবনের গৃহের ভিতর প্রবেশের পূর্ব্বে দরজার নিকট দাঁড়াইয়া উহাকে অনেক বাধা সহিতে হইতেছে। সেই জন্যই সকল প্রকার উন্নত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, বিদ্যায় দৃঢ় আসক্তি, মানুষের মহত্ব প্রভৃতি গুণ একেবারে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একটু একটু করিয়া চুয়াইয়া চুয়াইয়া যেন আমাদের গলা দিয়া নামিতেছে।

অতএব আমি পুনরায় বলি, এখন আমরা যদি আপনাদিগের হস্তে নারীজাতির শিক্ষার ভার লইতে পারি, তাহা হইলে ভারতরমণীদিগকে শিক্ষিত করিতে কত দিন লাগে? দশজন পুরুষের অপেক্ষা একজন উন্নতচরিত্র স্ত্রীলোকের উদাহরণ যে নারীসমাজে অধিক কার্য্য সাধন করে, তাহা কে না বুঝিতে পারে? স্ত্রী-হিতৈষী পুরুষেরা নিঃসন্দেহ আমাদের পরম বন্ধু ও অসীম কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহাদের দয়া, যত্ন ও পরিশ্রম না পাইলে হয়ত এতদিন আমরা পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারেই জীবন কাটাইতাম। তাঁহারা হাজার উদার ও দয়ালু হইলেও তাঁহারা পুরুষ। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ও আমাদিগকে ভিন্ন

প্রকারে সৃজন করিয়াছেন, এবং সমাজ তাঁহাদিগকে ও আমাদিগকে স্বতন্ত্ররূপ আচার ব্যবহার শিখাইয়াছে, সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের সাধারণতঃ একান্ত সমভাব হওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে শিখান ও চালানর ভার হিন্দু মহিলাদিগের উপর পড়া উচিত।

স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা যে জীবিকা উপার্জ্জন করা যায়, তাহা জেনানা মিসন, বাইবেল মিসন প্রভৃতির অনেক ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী শিক্ষয়িত্রী দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণও উহার প্রমাণ দিতেছেন। তবে স্কুলে পাঠাইয়া মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু গাড়ী, পাল্কী বা অন্য প্রকারে গৃহস্থের অন্তঃপুরে যাইয়া ভদ্র-মহিলাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াতে সমাজের কিছুই আপত্তি থাকিতে পারে না। বিশেষ হিন্দু অভিভাবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী ও কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য খৃষ্টান অপেক্ষা হিন্দু বা ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে যে অধিকতর যোগ্য বিবেচনা করিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে এ কাজ করিতে ভদ্র গৃহস্থ ও অসহায় স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ও বাধা কি? আর এমন সম্মানিত জীবিকার পথ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিতে আমরা কেন চিরকাল মুখ গুঁজিয়া পরের দাসত্ব করিব? আর আমাদের হিন্দু সংসারে কত যোগ্য স্ত্রীলোক থাকিতে বিদেশী বা ফিরিঙ্গী শিক্ষয়িত্রীগণ যে আসিয়া আমাদের শিক্ষয়িত্রীর পদে বসিবেন—ইহাই বা কিরূপ লজ্জাকর ও উপহাসজনক শুনায়?

অনেকে হয় ত বলিবেন, হিন্দুবালারা সচরাচর উত্তমরূপে লেখাপড়া জানেন না ও ইংরাজীতে বুৎপন্ন নহেন, কাজেই তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, হিন্দু পরিবারের মধ্যে আজ কাল এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা ঐ সকল খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীদের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানবতী। বাঙ্গালায় "চরিতাবলী" ও বড় জোর "নবনারী" পর্য্যন্ত, আর ইংরাজীতে "সেকেণ্ড" বা "থাড বুক অব্ রিডিং" বুঝিতে পারিলেই মিসনারীরা খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীদিগকে হিন্দু মহিলাদিগের জ্ঞান ও বিদ্যা বিতরণে সম্পূর্ণ পারদর্শিনী বিবেচনা করেন। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে বেশ বলিতে পারি যে, আজকাল অনেক ভদ্র হিন্দু মহিলা লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া "সীতার বনবাস" "কাদম্বরী" বা "চারুপাঠ" তৃতীয় ভাগ না পড়িয়া ক্ষান্ত হন না। তবে তাঁহারা সকলে ইংরাজী না জানিতে পারেন। কিন্তু আমার মতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুই ভাষারই কেবল "ষ র, ল ব" ও বি, এ, বে, ইত্যাদিতে বিদ্যার সীমা বাঁধিয়া না রাখিয়া বাঙ্গালী রমণীরা যদি শুধু মাতৃ-ভাষারই উত্তমরূপ চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথার্থ জ্ঞানবতীও হইতে পারেন এবং

সাহিত্য আলোচনার সুখভোগেও অধিকারিণী হইতে পারেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই জন্যই শিক্ষিতা বঙ্গনারীরা যত শীঘ্র নিজ হস্তে স্বদেশীয় ভগিনীদের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন, ততই আমাদের মঙ্গল। (ক্রমশঃ)

ছোট লোক কে?

উনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ বীরপুরুষ মহাত্মা নেপোলিয়ানের সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে অবরোধকালে তিনি একদা মিসেস্ বালকোম্বের সহিত পথে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় কতিপয় ভৃত্য একটি মোট বহন করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। নেপোলিয়ানের মত মহৎ ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া মোট বহিয়া লইয়া যাওয়া মিসেস বালকোম্বের চোখে ভাল বোধ হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তখন নেপোলিয়ান বাধা দিয়া বলিলেন "মহাশয়া! বোঝার সম্মান করুন"।

অনেকে পথের মুটে মোট বহন করিয়া লইয়া যায় বলিয়া তাহাকে ছোট লোক মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা হাতে কাজ করে বলিয়া মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহারা প্রকৃত মহত্ত্ব কিসে হয়, তাহা অবগত নহেন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে

"When Adam delved and Eve span,
Who was then the gentleman?"

আদম (মানব জাতির আদি পুরুষ) যখন কোদালী দ্বারা মৃত্তিকা খনন এবং তাঁহার পত্নী যখন সূত্র প্রস্তুত করিতেন, তখন কে ভদ্র লোক ছিল? রোমের আদি ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, যখন রোমের সৌভাগ্য রবি রোমের মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল, তখন রোমের সৈনিক পুরুষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন এবং অবসরকালে শস্যক্ষেত্রে যাইয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। বিখ্যাত রাজপুরুষগণও (senators) তাহাই করিতেন। তখন শারীরিক শ্রম করা তাঁহারা অপমান মনে করিতেন না। পক্ষান্তরে যখন দাসত্বের প্রথা রোমে প্রবর্ত্তিত হইল, তখন হইতে রাজপুরুষ ও অর্থশালী লোকেরা পরিশ্রম করা অগৌরবজনক মনে করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন এবং দাসদিগের হস্তে কৃষিকার্য্য প্রভৃতির ভার দিয়া নিজেরা বিলাসিতার ক্রোড়ে আরামে বাস করিতে লাগিলেন। তখনই রোমের সৌভাগ্য-সূর্য্যের অস্তমিত হইবার সূত্রপাত হইল। বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইত গেল রোমের কথা। প্রাচীন ভারতেও পরিশ্রম করা

অগৌরবের বিষয় ছিল না। ঋষিগণ এক দিকে যেমন পরা ও অপরা বিদ্যার চর্চ্চায় কালাতিবাহিত করিতেন, অন্য দিকে মাঠে যাইয়া গোচারণ করিতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথা পুরাণে অক্ষরে অক্ষরে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। যাক সে কালের কথা যাক। বর্ত্তমান কালে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কি দেখাইয়া গিয়াছেন? তাঁহার জীবনের দুই একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি শারীরিক পরিশ্রম ও মোটবাহীদিগকে কিরূপ চক্ষুতে দেখিতেন। একদা তিনি বাজার হইতে কোন জিনিস খরিদ করিয়া স্বহস্তে উহা বহন করিয়া কলিকাতার কোন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় কোন এক সম্ভ্রান্ত বন্ধু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন। প্রকাশ্য পথে বিদ্যাসাগর মোট বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তিনি ইহা দেখিতে পাইলে পাছে বিদ্যাসাগর মহাশয় লজ্জিত হয়েন, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি পাস কাটাইয়া যাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিলেন "আপনি মনে করিয়াছেন যে আমি এই মোট বহনের জন্য লজ্জিত হইব, এটা আপনার ভুল। আমি এজন্য বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নহি, কারণ এটা একটা কুকাজ নয়।" আর একবার তিনি ও তাঁহার এক বন্ধু কলিকাতা হইতে স্থানান্তর যাইতেছিলেন। তাঁহাদের মোট বহন করিবার জন্য সঙ্গে একটি মুটে লইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মুটে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইল। ইহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "এখন উপায়!" বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, তুমি মোট, আমি মুটে?" এই বলিয়া বাবুর স্কন্ধে মোট চাপাইলেন এবং স্বয়ং মুটেকে স্কন্ধে করিলেন। বিংশ শতাব্দীর কল্পিত সম্মানপ্রার্থী বংশাভিমানী ইহা নিকৃষ্টান্তঃকরণের পরিচায়ক মনে করিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, ছোট লোকের সঙ্গ করিলে মানুষের মন ছোট হইয়া যায়, সুতরাং সর্ব্বথা তাহা পরিত্যাজ্য। আমিও বলি ছোট লোকের সহবাসে আত্মা কলুষিত হয়। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের সহিত কিংবা বংশের সহিত আত্মার ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। মন যাঁহার উচ্চ, হৃদয় যাঁহার উদার ও প্রেমিক, তিনি যে কাজই করুন না কেন, যে বংশেই জন্মুন না কেন, তিনিই মহান্ সংজ্ঞা পাইবার উপযুক্ত। সুবিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা কেরি সাহেব এক দিন লাটভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতা কোন এক ভদ্রমহিলা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অপর এক ভদ্র মহিলাকে বলিলেন "দেখুন আপনি উহাকে জানেন, উনি একজন মুচির ছেলে।" তিনি শুনিতে

পাইয়া বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিলেন "না মহাশয়া মুচির ছেলে নহি, যে জুতা মেরামত করে, তাহার ছেলে।" প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা বংশের গৌরব করিয়া মহাত্মা কেরির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির আবাসভূমি হইতে পারে। কিন্তু মানবসমাজের কি দুর্গতি! যাহাতে লোকের প্রকৃত মহত্ত্ব স্থাপন করে, সে দিকে অনেকের লক্ষ্য নাই। কেবল বাহিরের কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া মানুষ সচরাচর ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্ব স্থির করে, এবং এই বিষম ভ্রান্তির জন্য সমাজের উন্নতির অন্তরায় হইতেছে। ভারতের নরনারী এই ভ্রমে পতিত হইয়া অনেকে আজ কাল শারীরিক পরিশ্রমকে অসম্মানসূচক মনে করিতেছেন। ইহার পরিণাম বিষময়। কেহ কেহ অর্থাভাব বশতঃ ঋণ করিয়া সম্মান রাখিতে প্রস্তুত, তথাপি মোট বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করা অপমানজনক মনে করিয়া তাহা করিতে প্রস্তুত নহে। এইরূপে ঋণজালে জড়িত হইয়া অনেক পরিবার অপার দুঃখার্ণবে পতিত হইতেছে। এই অনিষ্টকর কল্পিত সম্মানপিপাসা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

প্রতীকার।

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, আবহমানকাল মনুষ্যদিগের কোন বিষয়ের অভাব হইলেই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। রোগ হইলেই ঔষধের জন্য চেষ্টা হয়। শোক হইলে সান্ত্বনার চেষ্টা হয়। এইরূপ যখনই কোন অভাব উপস্থিত হয়, তখনই মানুষের মনে প্রতীকারের ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

সম্প্রতি যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার উন্নতির প্রয়োজন হইয়াছে, বোধ হয় সকলেই ইহা অল্পাধিক বুঝিতে পারিয়াছেন। পুরুষেরা এই কার্য্য সাধনের অধিকারী ও অগ্রণী, এবং ইহাঁরাই নেতা ও পরিচালক। কিন্তু এই বিষয়ে রমণীদিগের সহায়তার প্রয়োজন। নারীগণের সহায়তা না পাইলে পুরুষগণ দুরপনেয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কার্য্যসাধনে সমর্থ হইবেন না।

এ সংসারকে বিধাতা এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, নরনারীর পরস্পর সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব।

যখন পুরুষ ও রমণী দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা, সমভাবে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রত্যেকের প্রাণ ও মন

সমানরূপে সকল সুখ, দুঃখ, গুণ, ধর্ম্ম, কর্ম্মের আধার স্বরূপ, তখন কেন একের চেষ্টার উপর অদৃষ্ট স্থাপিত করিয়া অপরে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে।

পুরুষ যখন প্রকৃতি ভিন্ন কার্য্যকরণে নিতান্ত অসমর্থ, তখন নারীগণের উৎসাহ, উদ্যম, শ্রমশীলতা ও আত্মনির্ভরতা ব্যতীত উন্নতির পথ পরিষ্কার হইতে পারে না। রমণীগণ আপত্তি করিতে পারেন "ওমা এ কি জ্বালা, আমরা কি পাগড়ী বেঁধে দরবার করিব, না সভায় গিয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা দিব। আমরা কোণের বউ, চন্দ্র, সূর্য্য আমাদের মুখ দেখ্‌বে না; আমরা রাঁধবো বাড়বো, আর ছেলে মেয়ে মানুষ করিব।" বাস্তবিক ঐটী ত গৃহলক্ষ্মীদের প্রধান কার্য্য। কিন্তু আবার তাঁহাদিগকে অন্য সকল দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রাচীন কালের রমণীগণের সহিত আধুনিক নারীগণের স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? সুবর্ণ মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে থাকিলে যেমন উহার দীপ্তি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু সেই কাঞ্চনকে স্বর্ণকার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারে পরিণত করিয়া মণিমুক্তায় জড়িত করিলে, রাজা মহারাজার শীর্ষদেশে স্থাপিত হয়, তদ্রূপ যদি প্রত্যেক রমণীর মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উন্নতির পথ অনায়াসে পরিষ্কার হইতে পারে। প্রাচীন কাল হইতে যাঁহারা সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত, এখন কেন তাঁহারা শুধু তৈজসপত্রের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। এখন কেন তাঁহারা এক কর্ম্মে, এক ধর্ম্মে পুরুষগণের সহিত দীক্ষা প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য। ইহা যে কেবল পুরুষগণের দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অপব্যবহার, তাহা নহে। ইহা স্ত্রীজাতিরও স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগিতা এবং অলসতার ফল।

উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইলে কর্ম্মোদ্যম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। মনুষ্যমাত্রেরই যখন প্রাণে কামনা বা বাসনা স্বভাবজাত, তখন নিজ নিজ উন্নতির কামনা হৃদয়ে উদিত না হইবে কেন? আমরা সম্মুখে দেখিতেছি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং লোকে সেই আলোক ধরিয়া কত পথ ভ্রমণ করিতেছে এবং দিব্য বস্তু নয়ন মেলিয়া দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আমরা অন্ধকারে কূপমণ্ডুকের ন্যায় চিরদিন অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন কাটাই। আমরা ভাল মন্দ বস্তু চিনিতে পারি, সুন্দর সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দেখিলেই প্রলোভিত হই, এবং পাইবার জন্য আমাদের অন্তঃ-করণ বড়ই ব্যগ্র হয়। কিন্তু কিসে অবস্থা উন্নত হয়, তাহার উপায় কি চিন্তা করি? প্রাচীন কালের আর্য্য রমণীগণ কেনই বা পূজিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন, আর এখনইবা তাহার কেন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সকল অভাবের মূলে দেখা যায় শিক্ষা-হীনতা। অবশ্য কতকগুলি ভারতমহিলা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু উহা সমুদ্রে বিন্দুমাত্র পাদার্ঘের ন্যায়। পৃথিবীর দশ দিকে আলো করিতে হইলে,

তাহার এক দিকে বর্ত্তিকা জ্বালাইলে প্রতীকার হয় না।

বর্ত্তমান কালে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, সকল অবস্থার মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা সকলকেই কিসে রমণীগণের উন্নতি হইবে, কিসে তাঁহাদের অভাব ঘুচিবে, এই এক ধ্রুব লক্ষ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার উপায় খুঁজিতে হইবে।

ইহার মূলে কিসের প্রয়োজন? "শিক্ষার প্রয়োজন।" এই শিক্ষার অভাবেই আজি নারীদিগের এই দুর্গতি। শিক্ষাতেই ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল আয়ত্ত করিতে পারা যাইবে। প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত জগতে বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত কেহই সুমাতা, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইতে পারেন নাই।

আত্মনির্ভরতা ও উদ্যমশীলতা ব্যতীত রমণীগণ কখনই আত্মোন্নতি করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। মাতৃশক্তির এখনও যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব পুত্র ও কন্যাগণের সুশিক্ষা সম্বন্ধে ইতর বিশেষ না করিয়া শিশুকাল হইতে উভয়কেই যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে চেষ্টা করা উচিত।

কন্যা জন্মিবামাত্র মাতা বিবাহের জন্য চিন্তা করেন, কিন্তু তাহার জীবনটি কিসে সুন্দর ও কর্ম্মঠ হইবে, তাহার বিষয় চিন্তা করা কি মাতার কর্ত্তব্য নয়?

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতি পুরুষ অভিভাবকগণের উপর ছোট, বড়, সমুদায় সাংসারিকভার ন্যস্ত হইলে তাঁহারা একাকী সকল গুলিই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন না, সেই জন্য সহকারিণীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে অন্ধ, সে অপরের পথের সহায় হইতে পারে না। এই অবরুদ্ধ শিক্ষাহীন নারীসমাজের হস্ত, পদ, মন বদ্ধাবস্থায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়া বিচিত্র নহে।

কন্যাটির আট বৎসর বয়স হইতে না হইতেই তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য মাতা তাহার পিতাকে কত অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে বর্ণপরিচয়ের কয়টি অক্ষর তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল, তাহা দেখিতে অবসর পান না।

বিদেশী রমণীগণ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া অপরিসীম পরিশ্রম ও অর্থব্যয়, এবং কত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে লেখা পড়া শিখান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা সেটুকু প্রাণ খুলিয়া লইতে পারি না। কেবল দ্বিতীয় ভাগ কথামালার বিদ্যা শেষ হইলেই আমরা কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া ধন্য হই। পিতার যতই জ্ঞান বিদ্যার প্রভাব থাকুক না কেন, বাহিরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যতই যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিন না কেন, তাঁহাকে এখানে পরাস্ত হইতে হয়। যে দিকেই দেখা যায়, স্ত্রীশক্তি গৃহধর্ম্মে কর্ম্মে এখনও ন্যূন নহে। ইঁহারা নিজ নিজ সংসারে যেমন পুরুষদিগের মন্ত্রী, তদ্রূপ প্রতিবেশীদিগের ও আপনাদের সমাজের উপরও ক্ষমতা বিস্তারে বিশেষরূপে সমর্থ। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ হইতেছে যে,

এই নারীশক্তি যদি বিদ্যা ও জ্ঞানে সুশোভিত হয়, তাহা হইলে তাহা জগতের কত উপকার করিতে পারে।

হিন্দুমহিলার ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব। অতএব সেই ধর্ম্মরক্ষার্থও শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা উচিত।

কুসংস্কারপূর্ণ কতকগুলি লৌকিক আচরণে ধর্ম্মপালন হয় না, উহার জন্য জ্ঞান অর্জ্জন আবশ্যক। স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা যেমন নিজের উন্নতির জন্য উৎসুক ও লালায়িত, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীকেও তদ্রূপ হইতে হইবে। এজন্য ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় সর্ব্বত্র সকল স্ত্রীমণ্ডলীতে বিদ্যাশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন। অবশ্য বয়ঃস্থা মহিলাগণ আর বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা আপনাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির অবসর করিতে পারেন না। তাঁহারা মধ্যাহ্নের অবকাশকালে সকলে একত্রিত হইয়া বাজে গল্প বা পরকুৎসা-চর্চ্চা ত্যাগ এবং তাস, পাশা ও কড়ি খেলার আমোদ পরিহারপূর্ব্বক সদ্গ্রন্থাদি পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিমল সুখের আস্বাদ পাইবেন। এইরূপে দিন দিন তাঁহাদের বিদ্যানুরাগ বৃদ্ধি পাইলে সন্তানসন্ততিগণের জ্ঞান-পিপাসা বলবতী করিতে ও মার্জ্জিত রুচির অভিমুখে তাহাদের অন্তঃকরণ চালিত করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন। তখন আমাদের সম্মুখে যে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত, তাহাতে যত আগাছা জন্মিয়া ভাল ফসল নষ্ট করিতেছে, তাহার প্রতীকার হইবে।

অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ কার্য্য ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু তাহা স্ত্রীজাতি-বিগর্হিত কর্ম্ম নহে। এই প্রকার সৎ-কর্ম্মগুলি বাছিয়া তৎসাধনে স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইলে উন্নতি সম্ভবপর নহে। আমরা যখন কোন ভাল কাজ দেখি, তখন তাহার প্রশংসা করি বটে, কিন্তু তাহার অনুকরণ করিতে ভীত হই, বা তাহাতে আমাদের উৎসাহ হয় না। ইহার কারণ বহুকাল হইতে রমণীগণকে বিদ্যাবিহীন পশুবৎ অবস্থায় চালিত করাতে তাহাদের কোমল চিত্ত-বৃত্তিগুলি বিনষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সময়ের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে নারীগণের উন্নতির জন্য তাঁহাদের নিজ নিজ চেষ্টার অবসর আসিয়াছে।

পুরুষগণ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অর্থাগমের জন্য নানা উপায় চিন্তা ও নিরতিশয় পরিশ্রম করেন। কিন্তু অবসর পাইলেই তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকার পুস্তক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রাদি পাঠের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। আর এমনও অনেক রমণী আছেন, যাঁহারা ভুলিয়াও কখন কোন পুস্তক পাঠ করেন না। এমন কি কেহ কেহ বা সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জ্ঞাত নহেন। অবশ্য সকলেই এরূপ না হইলেও সাধারণের অবস্থা এইরূপ, তাহার সন্দেহ নাই। এ প্রকার অন্ধ মানবজীবন যাপনে ও শিক্ষার অভাবে কত যে ক্ষতি হইতেছে বুঝা যায় না। অথচ কন্যাদিগকে বাল্যকালে শিক্ষাদান ও চেষ্টার দ্বারা তাহাদিগের

মনের উন্নতি সাধন যে অসাধ্য, তাহাও নহে।

অতি দীন হীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীও যেমন প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবে নববস্ত্র উপহার পাইবার ইচ্ছা করেন, তদ্রূপ যদি তাহার সঙ্গে একখানি ভাল পুস্তক পাইবার ইচ্ছা করেন এবং তাহা নিজে পাঠ করেন, অথবা পাড়ার দশটি স্ত্রীলোক মিলিয়া একখানি মাসিকপত্র বা সংবাদপত্র লইয়া অবসরকালে তাহা পাঠ করেন, তবে তাঁহাদের কত উপকার ও আনন্দ হয়। আমাদের দেশে লেখকের অভাব অপেক্ষা পাঠকের অভাব আছে। বিদেশীয় স্ত্রীলোকেরা এ বিষয়ে অনেক উন্নত। এ দেশে কন্যাদের সমুচিত শিক্ষা এখনও একটা বড় মানবিক সখের মতন অনেকে জ্ঞান করেন। বিদ্যাশিক্ষাকে অর্থকরী ভাবে বেশীর ভাগ মাতারাই উপলব্ধি করেন, ইহাও একটা স্ত্রীজাতির উন্নতির অন্তরায় যে নহে, তাহা বোধ হয় না।

অনেক স্থলে দেখা যায়, রমণীগণ লেখা পড়া যতটুক শিখিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার কেবল কুরুচিপূর্ণ নভেল পড়াতে পর্য্যবসিত হয়। নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষের অভাবে সন্তানের পক্ষেও সেই ব্যবস্থা দাঁড়ায়। তাঁহারা বলেন, "থাক ঢের হয়েছে বাবা, তুমি বেঁচে থাক; দশ টাকা এনে খেতে পারবে, তাহা হইলেই হইল।" কিসে পুত্র কন্যা সুচরিত্র ও সুবুদ্ধি হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, সে ভাবনায় ও চেষ্টায় প্রণোদিত হওয়া মাতার বিশেষ কর্ত্তব্য।

অবশ্য অর্থ ভিন্ন সংসারে কোন কার্য্যসাধনই সম্ভবপর নহে। সেই অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিবার ক্ষমতাও গৃহসম্রাজ্ঞীকে অর্জ্জন করিতে হইবে। দেশের এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগের শিখিতে ও শিখাইতে যত্ন করা আবশ্যক। অলসতার কাল গিয়াছে। বলিতে আনন্দ হয় যে, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ের মহিলা মেম্বরগণ দ্বারায় একটি স্ত্রীপাঠ্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথায় বঙ্গরমণীর সংখ্যা দুইটি মাত্র। এই সমিতিতে প্রতি রবিবারে মহিলাগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করেন। সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা হইলে মহিলাদিগের উন্নতির আশা করা যায়।

জনৈক মহিলা।

অঞ্জলি।

আজি　এস হে আমার সাধনার ধন,
হৃদয়-সরোজ আসনে।
এস হে বাঞ্ছিত হৃদয় রঞ্জন,
অঞ্জলি দিব ও চরণে॥

আমি বহুদিন হ'তে সাজাইয়া অর্ঘ্য,
র'য়েছি বসিয়া এখানে।
ওই চরণ উপরে কুসুম স্তবক,
সাজায়ে দিতে সযতনে।
আর হৃদয় ভরিয়া দেখিতে তোমায়,
ধ্যান, ধারণার অতীত।
তোমার পূজায়, সঁপি মন কায়,
দিবস, যামিনী, প্রভাত॥
তবে, মলিনতা মোর, যাবে হৃদি হ'তে,
ও চরণপদ্ম পরশে।
ঘুচে যাবে ভ্রম, স্বার্থ অহমিকা,
মাতিব শাশ্বত হরষে॥
যবে তব নাথ! প্রেমের কিরণে,
এ হৃদি হইবে দীপিত।
দেব! জগতের কাজ, আমা হ'তে তবে
হ'তে পারে সাধিত॥
এবে এস পরমেশ! জাগাইয়া দাও,
লুপ্ত চেতনা আমার এ।
অঞ্জলি লও হে অধম দাসের,
চিত্তের তমো নাশিয়ে॥

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

প্রার্থনা।

সরল বিশ্বাসী মোরে করিও দেবতা,
মানব প্রেমিক যেন হ'তে পারি নাথ।
মুছাইতে দীনঅশ্রু, ব্যথিতের ব্যথা,
আমারে শকতি দিও, সদা সেবা ব্রত
পালিবারে পারি যেন কর্ম্মভূমি পর।
নশ্বর জীবন লভি যত দিন ভবে
হবে থাকিতে আমারে দয়াল ঈশ্বর,
শ্রীচরণে দিও স্থান এ দাসেরে তবে,
যে দিন এ জীবদেহ হবে অবসান,
শুনিয়া মহাকালের গম্ভীর আহ্বান।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

প্রাচীন ভারতের অনুলেপন দ্রব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রাচীনকালে বিলাসী লোকে কুঙ্কুম ও কস্তুরীর অনুলেপন ব্যবহার করিতেন। সুরভি, তনুকান্তিকরং ও কোন কোন পীড়ানাশক বলিয়া শাস্ত্রে কুঙ্কুমলেপনের বিধি আছে। উহা অনেক স্থলে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারস্য দেশজাত কুঙ্কুমই প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি, অভিধানে কুঙ্কুমপর্য্যায় শব্দগুলির মধ্যে কাশ্মীরজন্ম, কাশ্মীররাজ, বাহ্লিকবর, বাহ্লিক প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সে কালের ধনী লোকে কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুমই অধিক আদর করিয়া গাত্রে লেপন করিতেন।

কস্তুরী অত্যন্ত সুরভি। উহা মুখ

রোগ ও চক্ষুরোগ নাশ করে। গণ্ডস্থলে লেপন করিলে উহার গন্ধ প্রীতি দায়ক হইত, মুখ ও চক্ষুর পীড়া হইবারও সম্ভাবনা থাকিত না, এই জন্য বিলাসিনী কামিনীগণ উহা গণ্ডস্থলে লেপন করিতেন। রাজনির্ঘণ্ট নামক পুস্তকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নেপাল, কাশ্মীর ও কামরূপ, এই তিন স্থানে কস্তুরী পাওয়া যাইত। তন্মধ্যে কামরূপোদ্ভবা কস্তুরী শ্রেষ্ঠ ও নেপালদেশজাত কস্তুরী মধ্যম। ইহা ভিন্ন অন্যত্রও কস্তুরী পাওয়া যাইত।

সে কালে গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপন দ্রব্যের প্রচলন এত অধিক ছিল যে, বহুলোক ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিত। বহুসংখ্যক গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী বণিক ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ঐ সকল সংগ্রহ বা ক্রয় করিয়া নানা স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেন। কালক্রমে সঙ্করজাতির উৎপত্তির সহিত গন্ধবণিক্ নামক এক জাতির উদ্ভব হয়। উহারা কেবল গন্ধদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত এবং অনেকে উহাতে বেশ ধনসম্পন্নও হইত। মালাকরগণ ঘৃষ্ট গন্ধ, পুষ্প ও মাল্যাদি গৃহস্থদিগের ভবনে প্রায় যোগাইয়া দিত এবং কখন কখন বা সেই ঘৃষ্ট চন্দনাদি লেপন করিয়া দিত। সুতরাং গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ী বলিয়া গন্ধবণিক্ ও মালাকর এই দুই জাতির বেশ সম্মান ছিল।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে "স্বয়ং ঘৃষ্ট চন্দন গায়ে মাখিবেন।" ইহাতে বোধ হয় তৎকালে পরস্পর পরস্পরকে আদর করিয়া ঘৃষ্ট চন্দন প্রদানের রীতি ছিল। বিলাসিনীগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন বেশ ভূষা করিতেন, তখন চন্দনাদি অনুলেপন গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানে মাখাইতেন। অনেক সময়ে সহচরীগণ উহা যথাস্থানে লেপন করিয়া দিতেন। ইহা ভিন্ন বিলাসিনীগণ পাদদ্বয়ে এক প্রকার অনুলেপন দ্রব্য ব্যবহার করিতেন উহা অলক্তকদ্রব। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত অলক্তক বিশেষ ভাবে নিষ্পেষিত করিয়া জলের সহিত গুলিয়া লইয়া পায় মাখান হইত। উক্ত দ্রবের সহিত কখন কখন বিবিধ সুগন্ধদ্রব্যচূর্ণও মিশাইয়া দেওয়া হইত।

প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কপালে অনেক প্রকার ফোটা করার নিয়ম ছিল। ঐ গুলির অনেক প্রকার নামও ছিল। তমালপত্রাকৃতি ফোটাকে তমালপত্র বলা হইত, তিলপুষ্পাকৃতি ফোটার নাম তিলক ছিল। এই তিলক কথাটী বোধ হয় ফোটামাত্রেরই উপলক্ষণ ছিল, অথবা এই তিলক হইতে কালক্রমে ফোটামাত্রকেই তিলক বলার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার ফোটাও তিলক নামে আখ্যাত হইত। বোধ হয় এই গুলি বিলাসীদিগের শোভাসম্পাদক তিলক ছিল। ইহা ভিন্ন উপাসনাদির অনেক প্রকার ফোটা ছিল, ঐ গুলির ঊর্দ্ধপুণ্ডরীক ও ত্রিপুণ্ড্রক প্রভৃতি নানা

নাম ছিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে চন্দন দ্বারা যথেচ্ছভাবে তিলক করিতে পারা যায়।

এই প্রবন্ধে যে কয়েকটী অনুলেপন ও বিলেপন দ্রব্যের নাম লিখিত হইয়াছে, এবং উক্ত বিধ আর যে যে গন্ধদ্রব্য পুরাকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সে গুলির কোনটীই অপবিত্র নহে। এইজন্য উপাসনাদির উপকরণসমূহের মধ্যে ঐ গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎকালীন ও বসন্তকালীন দুর্গোৎসবের মহাস্নানোক্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে সুগন্ধি তৈল, বিষ্ণু তৈল, বিবিধ প্রকার দ্রব এবং অনেকগুলি অনুলেপন দ্রব্য ও বিলেপন দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়। স্ত্রীদেবতার উদ্দেশে অলক্তক ও বামালেপোচিত বস্ত্র নিবেদনের রীতি আছে।

এই সকল আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্যে বিলেপন দ্রব্যের ব্যবহার ছিল। শরীরের শীতাতপ নিবারণের ও গাত্র সুগন্ধ করিবার জন্য বিলেপন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। নিয়মিত বিলাসিতা যখন দোষের নহে, তখন বিলাসোপকরণসমূহের মধ্যে বিলেপন দ্রব্য ব্যবহার করাও দূষণীয় নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের অনুলেপন দ্রব্যগুলির অধিকাংশই সহজলভ্য ও অল্পব্যয়সাধ্য। অতএব কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে পবিত্র ও সহজলভ্য উপকরণ, অনুলেপন ও বিলেপন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া প্রীতি ও উপকার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম,
কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ।

স্বর্গীয়া কুমারী যোগপ্রভা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত দৈনিক লিপি।

আজ আমরা যে স্বর্গীয়া কুমারীর জীবনচিত্রের অস্পষ্ট ছায়া তাঁহার স্বহস্তলিখিত দৈনিক লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠিকা ভগিনীদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই কুমারী বঙ্গের একটী সম্ভ্রান্ত আদর্শ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একটী আদর্শ মহিলা-রত্নরূপে গঠিত হইতেছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিধাতার বিধানে এই স্বর্গীয় কুসুমটী পূর্ণরূপে ফুটিতে না ফুটিতে ২২ বৎসর বয়সে উত্তপ্ত সংসারবৃক্ষ হইতে অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক ইঁহার বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য ও উদার প্রেম ইঁহাকে স্বর্গেরই উপযুক্ত করিয়াছিল। তাই ভগবান্ এই

দুঃখতাপপূর্ণ পৃথিবী হইতে তাঁহাকে আপন নন্দনকাননে—যেখানে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ পৌঁছিতে পারে না—হৃদয়কে দগ্ধ করিতে পারে না, যেখানে চির আনন্দ চির সুখ সর্ব্বদা বিরাজ করে, সেই স্বর্গীয় শান্তি কাননে লইয়া স্থাপন করিলেন। যাঁহারা সংসারে থাকিলে সংসারকে স্বর্গের স্থান করিতেন, জগতকে ধন্য করিতেন, ভগবান্ এমন সন্তানদের জন্য বোধ হয় এ পৃথিবীর সৃষ্টি করেন নাই। তাই যে ভাল, তাকেই তুলে লন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা চির দিনই জয়-যুক্ত হইবে, তাঁহার ইচ্ছারই জয় হউক। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা নানা শিল্পে সুদক্ষ ছিলেন এবং হার্ম্মোনিয়াম যোগে অতি সুমিষ্ট স্বরে ভক্তির সহিত সুন্দর সঙ্গীত করিতেন। এই বালিকা অতি অল্প দিনই এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। এই অত্যল্প কালের মধ্যে নিষ্ঠা, দয়া, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা দ্বারা নিজের জীবনের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে তাহার জন্য সাধনা করিয়া জগতে একটী সুন্দর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয় স্বজনকে নিজ সুমিষ্ট গুণাবলীর দ্বারা মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পিতামাতার সেবাই তাঁর জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি মাতৃসেবায় জীবন-পাত করিয়াছিলেন।

এই অল্প দিনেই অনেকগুলি তীব্র আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাণের ভাই ভগিনী দিগের ভালবাসা হারাইয়া তাঁহার কোমল প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস ও নির্ভর এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হয় নাই। নিম্নে তাঁহার দৈনিক লিপি হইতে কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার জন্মদিনে ভগবানের চরণে নিবেদনটী তাঁহার রোগ-শয্যায় লিখিত।

"জননি! আজ একটী বিশেষ দিন, আজকের দিনে উনিশ বৎসর আগে তুমি অতি নির্জ্জনে তোমার করুণার চিহ্ন-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র জীবন দান করেছিলে। তুমি এই দীর্ঘ উনিশ বৎসরের মধ্যে এই জীবনকে সুখ দুঃখ স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য, কত কি দিলে। আবার কত যন্ত্রণা বেদনা, মর্ম্মভেদী কত ভাব, কত প্রলোভন থেকে রক্ষা করলে, সে সকলের জন্য হৃদয় হইতে আজ গভীর কৃতজ্ঞতা উঠিতেছে। আমার জীবন লক্ষ্যশূন্য হ'য়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিল, কি যে ছিলাম জানি না, তুমি দয়া করে নিজ হাতে ধরে আমার জীবনকে ফিরিয়ে দিলে। খুব বেদনা দিলে ভাল করলে, আমার এ কঠিন হৃদয়ে কোন ভাব মুদ্রিত হইত না, তাই তুমি খুব যন্ত্রণা এবং রোগের ভিতর দিয়ে তোমার পথ প্রশস্ত করিলে। আমায় বড় ভালবাস কিনা, তাই সেই এক দিন সত্যই তুমি কঠিন আঘাতে আমার মোহ-বন্ধন ছিন্ন করে আমার কঠিন হৃদয় ভেদ করে নিজে প্রকাশিত হ'য়েছিলে। উঃ সে

যন্ত্রণা আর—তার পরের শান্তি কি মধুর, কোমল শান্তি, তাহা এ জীবনে ভুলতে পারি না। সেই দিন আমার জীবনের গতি চিরদিনের জন্য ফিরেছে। পাপীকে তুমি সত্য সত্যই এত করুণা কর। যে তোমায় চায় না, যে তোমায় ভুলে থাকে, তাকে তুমি সত্য সত্যই আপনা হতে দেখা দিয়ে উদ্ধার কর, তাহা সেই দিন থেকে জেনেছি।

জননি আজ হৃদয়ের দ্বার খুলে এই প্রার্থনা করি তুমি আমায় একটু একটু করে তোমার পথে অগ্রসর কর। সংসার বড় পিচ্ছিল স্থান, আবার যেন আমি পড়ে না যাই এমন করে আমার বিবেককে জাগ্রত কর। তোমার কথা কেমন করে শোনা যায় তা ভাল করে বুঝিয়ে দাও। আমি অন্ধ ও দুর্ব্বল, তুমি আমায় তোমার পথে নিয়ে চল। অন্তর্যামী তুমি, আমি যেতে চাই, সংসার এসে আমায় অন্ধ করে, তাই পারি না। যত দুঃখ বেদনা দাও ক্ষতি নাই, সব বহন করতে প্রস্তুত আছি। তুমি কেবল বহন করবার বল ও সহিষ্ণুতা দেও। আমার হৃদয়কে মুক্ত কর এবং আমার চঞ্চল চিত্তকে শান্ত কর। আমার হৃদয়ের কামনাকে উচ্চ কর ও একেবারে আমার হৃদয়কে নিয়ে নাও, আমার হাতে রেখো না। আমার অভাব আমি নিজেই জানি না, তুমি আমার অভাব সব দেখিয়ে দাও। আজ থেকে যেন রোজ রোজ একটু একটু করে সাধন করে তোমার দিকে অগ্রসর হতে পারি। আমার অস্থির চিত্তকে সংযত কর, শান্ত কর, আজ তোমার কাছে এই ভিক্ষা। এইগুলি রোজ রোজ যেন মনে রাখতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর, এরূপ বল দাও। আমার যে সব ভগ্নীরা এখনও বাহ্য দৃশ্যে মুগ্ধ, তাঁদের জ্ঞান দাও।"

"আমার হৃদয়ের দেবতা! আমায় সুপথ দেখাও। উঃ! এ ঘোর পরীক্ষায় এমন দুর্ব্বল চিত্তকে কেন ফেলছ! যদি ফেলেছ, তবে উহার উপযুক্ত কর। তুমিই তো আমায় এই বিবেক ও সহজ জ্ঞান দিয়েছ! তবে আমায় এই সংগ্রামে জয়ী হতে বল দাও, আমি তো দুর্ব্বল। আমি এমন ক্ষুদ্র অথচ তার ভিতর তো তুমি খুব মহৎ ভাব দিয়েছ, তবে তাহাকে তুমিই পরিচালিত কর, আমি তা কেমন করে পারব? দেব! তুমি আমাকে আরও উচ্চ জ্ঞান দাও, দেখো তোমার নামে যেন কলঙ্ক না আরোপ করি। হৃদয় বড়ই বিচলিত হচ্ছে, তুমিই ভরসা। আমায় ধরে রাখ। যাহা তোমার অভিপ্রেত, তাহা পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে পূর্ণ হোক। আমার ইচ্ছাকে দলিত ও চূর্ণ করে ফেল, তোমার ইচ্ছার নিকট যেন আমি চির-অবনত থাকি। আমায় দিব্য জ্ঞান দাও। সংসারে আমার কেউ নাই, তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

(খ্রীষ্টের জন্মদিন।)

"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

হে দেবতা! যে সমুদ্রে আমি ঝাঁপ দিলাম, তুমি তাহা হ'তে আমাকে উদ্ধার কর!

"হৃদয়ের দেবতা! এতদিন কি অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম, আজ সহসা তুমি কেমন উজ্জ্বল জ্ঞান দিলে। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এই জীবন তরণীর ভার একা নিতে উদ্যত হয়েছিলাম, হঠাৎ তোমার আবির্ভাব কেমন সুস্পষ্ট বোধ হোলো। নানা চিন্তায় আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হয়েছিল। মানুষ বুঝি আমার জীবনকে নিয়মিত করবে, আমার নিজের চেষ্টায় বুঝি উঠবো। এমনি অধম আমি, তখনি সহসা মনে হোলো—"জানিহে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না, তুমি দিবেনা ফেলি বিনাশ ভয় পাথারে। তবে আর ভয় কি? পৃথিবী আমার কি করতে পারে? তোমাতে মন প্রাণ দিলেই তুমি রাখবে। কিন্তু দেবতা সেটাইত দিতে পারি না, তুমি দয়া করে শিখিয়ে দাও। আমার হৃদয়কে শূন্য করে দাও। সেখানে তোমার মহিমাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কর।"

"জননি! সংসার বড় দুর্গম। পদে পদে এত ভ্রান্তি প্রমাদ আসে কেন? মানুষ বেশ থাকে, সময়ে সময়ে আপনাকে সংযত করতে পারে না, তাই এত প্রমাদ। এত দুর্ব্বল আমি, তুমি আমায় এই পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে কেন রেখেছো। নিয়ত অশান্তি, কিছুতে সুখ পাই না। মনটা এমনি কঠোর হয়ে উঠেছে যে, তোমার প্রেমের পরিবারটাকে যেন ভয়ানক হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য বলে বোধ হয়। মনটা যেন নীরস কঠিন পাথরের মত হয়েছে, কাহাকেও ভালবাসতে পারি না, যেন কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, কঠোর কর্ত্তব্য পালন করছি। এ দুর্দ্দশা হতে আমায় উদ্ধার কর। তোমার প্রেম দিয়ে হৃদয়কে শীতল কর। মনে তোমার পবিত্র শান্তি দাও। আমি একলা পড়েছি, কোন আদর্শ নাই।

তোমাকে ভাল করে ধরতে দাও, তোমার ঐ মহান্ আদর্শ জীবনের সম্মুখে রেখে তোমাকে কাণ্ডারী করি। সময়ে সময়ে মনে তোমার প্রভাব আসে, তখন একটু শান্তি পাই, আবার পৃথিবীর অন্যায়, অবিচারে দুর্ব্বল মন বিক্ষিপ্ত হয়। সংসারে অবিশ্বাস হয়, আমার হৃদয়ে তোমার প্রেম দাও। সকলকে প্রাণভরে ভাল বাসতে শিখাও। প্রাণভরে সকলের সেবায় প্রবৃত্তি দাও। আশীর্ব্বাদ কর।"

"দেবতা, এই সংসার বড় উত্তপ্তস্থান। এর বাহিরে থেকেই হৃদয় শুকিয়ে উঠছে, না জানি এর ভিতর কি আগুন আছে। এত গুলি সংসার দেখছি, কৈ "সুখ" তো কোথাও নাই? সংসারে কি প্রকৃত সুখ থাকে না? তবে মানুষের এত সংসারের লালসা কেন? আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে মহান্ সুখের আদর্শ রেখেছো, তা তো সংসারে দেখি না, তা যদি না দেখি তবে সংসারে লাভ? দুদিন পরেই তো যেতে হবে। আমার শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, আমি কি করবো? যবে থেকে তুমি আমায় জানতে দিয়েছো যে এ শরীর আমার নয়, তোমার কাজ সাধনের জন্য দিয়েছো, এ শরীর আমি নষ্ট করলে তোমার কাজ অবহেলা রূপ মহাপাপ হবে, আমি সেই দিন হতে

সাধ্যমত ইহাকে রক্ষা করতে যত্ন করি। কিন্তু আমার মন দুর্ব্বল, আমায় বল দাও। আমায় যত দিন এ পৃথিবীতে রাখিবে, শীঘ্র শীঘ্র কাজ বুঝে শেষ করিতে দাও, এই ভিক্ষা।"

"প্রভো! তোমার একি ভাব? শরীরের সামর্থ্য কেড়ে নিয়ে কাজের ভার চাপিয়ে দিলে, আমি কি করি? সামর্থ্যের অভাব আমায় প্রতিপদে মনকে বিচলিত করে। তুমি দয়া করে এইটুকু বিশ্বাস দিয়েছ যে, তোমার নিয়োগের প্রতীক্ষা করে থাকলেই সময়ে সুফল ফলবে ও সুখী হব। কিন্তু দুর্ব্বল মন বিচলিত হয়, আমি দিশাহারা হই, বল দাও। আমি পদে পদে আমার কর্ত্তব্য বুঝেও তা সম্পন্ন করিতে পারি না, আমায় ধৈর্য্য দাও।"

"জননি, কর্ত্তব্য বড় কঠিন। কিন্তু এখন বুঝেছি ইহাই অবশ্য ও একমাত্র কর্ত্তব্য। আর বুঝি অল্প দিনই ইহা করতে হবে, ভবিষ্যতে আর কখনও করতে হবে না। আমরা যে মার মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি, তাঁর সেবা আরও পূর্ণরূপে করিতে দাও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কত ত্রুটি হয়ে যায়, শেষে কষ্ট পাই। শরীর মনে বল দাও, যা হয় হোক্ প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করি, এই আশীর্ব্বাদ কর।"

সব শেষ হয়ে গেল! এত কষ্ট, যন্ত্রণা, সংগ্রাম এত দিন থেকে হচ্ছিল, কেবল একটি মুহূর্ত্ত, একটী নিঃশ্বাস, তার পরই সব শূন্য, জড়। সুখ দুঃখ, অভাব তৃপ্তি, পার্থিব কোন ভাব আর নাই, সব নিষ্ফল। এ তোমার কি রহস্য? কেউ জানে না, বোঝে না কি ব্যাপার, এ দেখে লোকে ভীত, ত্রস্ত, নির্ব্বাক্। প্রভো! তোমার এ মহা প্রভুত্বের অন্তরালে কি আছে বল। শরীরের ভিতর তোমার যেটুকু অংশ ছিল তা কোথায়? শুনি যে আত্মা তোমারি মধ্যে, কিন্তু সে কিরূপ তা বুঝি না, দয়া করে বুঝিয়ে দাও। এই সব দেখে শুনে সংসার এতই অনিত্য বোধ হয়, কিন্তু সবের ভিতর যে তুমি নিত্যরূপে রয়েছো। জ্ঞানী ভক্তেরা তোমার যে ভাব দেখে জগতে প্রচার করেছেন, সে ভাব আমার অন্তরে প্রকাশিত কর, আমায় সংসারে মুগ্ধ হতে দিও না। এ সংসারে শোক বা দুঃখের কিছুই নাই, এ ভাবে অন্তর পূর্ণ কর। কেবল সেই যে আত্মা, তোমার অংশ, সকল সদ্‌গুণের সমষ্টি, তাই আত্মস্থ করতে দাও, এই ভিক্ষা।"

"আমার হৃদয়ের দেবতা! আমি জানি তুমি আমায় রক্ষা করবে, কিন্তু এমন সহজে, মানবের অবোধ্য অতি সহজ এমন উপায়ে যে কর তা জানতাম না। আমার কিছুই বিশ্বাস নাই তাতেই এত, তবে যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার কাছে প্রার্থনা করলে তো তুমি আমাকে পরিপূর্ণ করে ছাপিয়ে দেবে। বিশ্বাসকে খুব বাড়িয়ে দেও!"

"মঙ্গলময়ি! আজ জীবনের আর একটী দিন কাটলো, আমার জীবনের আর একটী ব্রত উদ্‌যাপিত হোলো। আমার এ দুর্ব্বল হৃদয় কত আঘাতে চূর্ণ

করলে, কত রোগ ভোগ করলাম, কত কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি হলো। সবের ভিতর দিয়ে তুমি কত শিক্ষা দিলে। এখন আমাকে স্বাস্থ্য দেবার জন্য তুমি এখানে আনলে, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। আমার এই শরীর দিয়ে তোমার জগতের যেটুকু কাজ হয় তা সম্পন্ন করে লও। সকলের কত সেবা কত যত্ন পেয়েছি, এখন আমাকে প্রাণভরে সকলকে সেবা করতে দাও। আমার হৃদয় খুব উদার প্রশস্ত কর, সংসারের কর্ত্তব্য সাধন, আর তোমাতে নির্ভর, এই দুটী বিশেষরূপে করে দাও।

আমাদের মার ন্যায় সহিষ্ণুতা, প্রসন্নতা, বৈরাগ্য দাও। মোহ দূর করে হৃদয়কে তোমার আলোকে উজ্জ্বল কর, তোমার শ্রীচরণে ব্যাকুল হৃদয়ে এই ভিক্ষা।"

"জননি! এই সংসার বড়ই পরীক্ষা-পূর্ণ। আমি দুর্ব্বল, সর্ব্বদাই টলমল করি। তুমি সর্ব্বদা উচ্চের দিকে টানছো, অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে একপদ অগ্রসর হতে না হতে সংসার এক আঘাতে দশ পদ নীচে ফেলে দিচ্ছে। তখন নিরাশায় হৃদয় ভেঙ্গে যায়। তুমি বল দেও। বড় কষ্ট পাই, কত অন্যায় করি, কিছুই বুঝতে পারি না। দয়াময়ি! তুমি সহায় হও। তোমার মঙ্গল হাতের এই বেদনাযুক্ত দানের পরিবর্ত্তে যেন মুক্তি না চাই। তুমি সহিবার শক্তি দাও, বল দাও, তোমার পথে নিয়ে চল।"

"চিরমঙ্গলময়! তোমার পরিচালনা আমাদের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিল। আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছা পূর্ণ হোলো, চির জীবন তাই হোক। কিন্তু এখন ভাবছি আমাকে কেন রাখলে? আমি অজ্ঞান, কি বুঝবো, তুমি বুঝিয়ে দাও। তোমার আরো কি গূঢ় ইচ্ছা আছে তা আমি জানি না। ধীর ভাবে আমাকে তা বুঝিতে দাও। এই রম্য স্থানের চারি দিকে স্নেহময় আত্মীয় স্বজন, এঁদের চরিত্রের মধ্যে থেকে সদ্‌গুণ যা শিক্ষণীয় তা শিখিতে দাও। সকলের সহিত স্বর্গীয় আসক্তিবিহীন প্রেমে বদ্ধ হতে দাও। সর্ব্বোপরি তোমাকে আরো ভাল করে জানতে ও বুঝতে দাও। তোমার চরণে এই প্রাণের ভিক্ষা, তুমি পূর্ণ কর।"

"জননি! বিচিত্র তোমার লীলা? এতদিন রোগশয্যায় রাখলে, রোগ-শয্যাতেই আমার জীবনের একটী নূতন দিন চলে গেল। এ কেন করলে তুমিই জান। সে দিনে আত্মীয় স্বজনের কত অযাচিত আশীর্ব্বাদ, শুভ ইচ্ছা, আর তোমার দান অসুস্থতা! তাও মন্দ লাগে নাই। তার ভিতরেও বেশ এক রকম নির্ম্মল শান্তি ভোগ করছিলাম। আমার সহজেই মনে হয় এই দুর্ব্বল শরীরে কোন কাজই হবে না, কারো সেবা করতে পারব না, কেবল সেবা নিতে হবে, আর সকলেরই কষ্ট, কারো সুখ হবে না। তবে এ শরীরে প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমার অভিপ্রায় কি জানি না, কেন যে রেখেছ, আমার দ্বারা কি কাজ যে হবে, জানি না। তবে হোক, আর যে কয়দিন

রাখবে শীঘ্র শীঘ্র সে কাজ করিয়ে নাও। আর আমার মনকে বেশ প্রশান্ত বিকার-শূন্য কর।"

"দেবতা! তোমার কৃপায় দিনগুলি মন্দ যাচ্ছে না। মনটা একটু দৃঢ় হয়েছে, আরও দৃঢ় কর। তোমার চিন্তায় অন্তরকে আরও পূর্ণ কর। উৎসাহ উদ্যমের অভাব দেখছি, তাতে কোন কাজ এগোবে না, আরো বল দাও। আমার মনকে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দাও। ধীরতা দাও, যেন উদ্দীপ্ত ক্রোধকে শান্ত করতে পারি।

"মঙ্গলময়ি মা! তোমার বিধান মঙ্গল-পূর্ণ। এই কয়দিন তোমার এই কয়টী সাধককে আমাদের মধ্যে এনে কত উচ্চ ভাব, উচ্চ জীবন, মধুর উপাসনা, এ সব লাভ করবার সুযোগ দিলে, কেমন সুন্দর নূতন শিক্ষা দিলে ও কত নূতন ভাব মনে হোলো, কিন্তু ইহা যেন ক্ষণিক না হয়। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন এর ভিতর থেকে নূতন বিষয় সব শিখতে পারি। জীবনকে উন্নতির দিকে নিয়ে চল, মনকে আরও স্থির কর, সংসারে অবিচলিত কর, আশীর্ব্বাদ কর, তোমাতে বিশ্বাস খুব বাড়াও।"

"দিন, সপ্তাহ, মাস গিয়ে গিয়ে একটী বৎসর কিভাবে কাটলো মা তুমি যেমন জান, আমি তেমন জানি না। এ বৎসর কত রোগ, দুঃখ, মানসিক কষ্টের মধ্যে কত বিদ্বেষভাব, অসৌহৃদ্য মনকে কলঙ্কিত করেছে। যা কখনো জানতাম না, তা মন কখনো চিন্তা করবে ইহা ভাবি নাই। এ ভাবে আমার দিন কেটেছে, সে জন্য বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। লোকের প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, কত রাগ করেছি তার শেষ নাই, মন শিথিল, সংসার অপ্রীতিকর।

কিন্তু মা! তোমার কাছে সেই জন্য কাঁদি, আমি কি কোরবো বলো—সর্ব্বদাই বর্ত্তমান অবস্থা ভাল লাগে না, এ যে আর এক মহাপাপ। আমি কি তবে তোমার বিধান অবহেলা করে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছুক? তাও তো নয়। এত অধৈর্য্যের মধ্যেও তোমার দয়া অনুভব করছি। যখন মন বড় অশান্ত হয়, তখন তুমিই তো শান্তি দাও, তখনকার জন্য তুমিই একটু বুঝতে দাও যে, এত বিপদসঙ্কুল অবস্থায় পড়িছি তাই তো সংসারে অনাস্থা। ভবিষ্যতে যদি সংসারে প্রতিষ্ঠিত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তখনো যেন এমনি অনাসক্তির সঙ্গে সংসারে থাকতে পারি এই করো।

এ বৎসর এই প্রাণের ভিক্ষা যে, আমার মনকে খুব স্থির কর্ত্তব্যশীল কর। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পাপীর জন্য তুমি অনেক যত্ন করছো, আমায় তার উপযুক্ত কর, আর আমার হৃদয়কে অবনত কর, সকলের সেবা করবার উপযুক্ত কর। তোমার সঙ্গে কিরূপ যোগে যুক্ত হতে হয় তা শিখাও। তোমার শ্রীচরণে ভিক্ষা করি আমার প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।"

আংটি।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখান হইতে এক অ-স্বস্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে সাগরকূলের বালুকার মধ্য হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করা একটা সখের কাজ জুটিয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন যেমন ছড়ি দিয়া বালুকার স্তর লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া থাকি, সেদিনও সেই রকম করিতে করিতে একটা হীরার আংটি কুড়াইয়া পাইলাম। আংটিটা গিনি সোণা বা তাহার কিছু কম দরের সোণায় প্রস্তুত। সচরাচর বাজারে এরকম সোণার আংটি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না, ফরমাইস দিয়া গড়াইতে হয়। আংটিটার মাঝখানে একখানি বড় কমলহীরা। বালুকা লাগিয়াছিল, ভাল করিয়া ধুইতেই হীরা-খানা মেঘমুক্ত নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বেশ দামী হীরা, ওজনে এক রতির উপর হইবে। কাটাটার মধ্যেও বেশ একটু নিপুণতার চিহ্ন ছিল, এবং এই টুকুই এই কুড়ানো জহরতটির বিশেষত্ব। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে হীরাখানাকে ছোট একটি ফুলের মতন দেখাইত।

বাড়ী আসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। আংটির বর্ণনাটা দিলাম না, শুধু এইটুকু মাত্র লিখিলাম "...সমুদ্রতটে একটি আংটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। আংটির বিবরণ সহ এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র"।

প্রথম সপ্তাহে আমার বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিল না। কোন লোকই আংটিটার দাবী করিতে আসিল না, কেহ পত্রও লিখিল না। মুস্কিলে পড়া গেল, পরের জিনিষ, ইহা লইয়া আমি এখন করি কি? দামী জিনিষ, ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়, কাছে রাখা আরো অনুচিত। তবে কি কোন দাতব্য কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া দিব? হাঁ, এই পরামর্শই ঠিক, সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া আংটিটি মুড়িয়া শীল করিয়া একটি সৎকর্ম্ম-ভাণ্ডারেই পাঠাইয়া দিই। অভাবগ্রস্তগণেরও কিছু উপকার হইবে এবং আমিও পরের বোঝা ঘাড় হইতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব!

আংটিটি ছোট একটি টিনের কৌটায় পুরিয়া কোথায় পাঠাইব ভাবিতে গিয়াই সর্ব্বপ্রথমে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কথা মনে হইল। লেবেলের উপর ঠিকানাটি লিখিতেছি এমন সময় ভৃত্য আসিয়া দুই খানি পোঃ কার্ড দিয়া গেল। হাতের কাজ টুকু শুভ কর্ম্ম বলিয়া প্রথমে তাহা করিলাম। শীল্ করা হইয়া গেলে বাতিটা

নিবাইয়া দিয়া একখানি কার্ড তুলিয়া পাঠ করিলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা।

"মহাশয় অতি সজ্জন! একালে এরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রায় চক্ষে পড়ে না। দুই মাস গত হইল আমার অঙ্গুরীয়টি স্নানের সময়...সমুদ্রজলে পতিত হয়। ইহা সেই অঙ্গুরীয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নঠিকানায় মদীয় ভবনে উহা প্রেরণপূর্ব্বক চিরবাধিত করুন।"

স্বাক্ষর ছিল চারুচন্দ্র কর্ম্মকার। দ্বিতীয় পত্রও প্রায় এই প্রকার। বেশির ভাগ তাহাতে এইটুকু ছিল "আমার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতি এই অঙ্গুরীয় আমার জীবন সদৃশ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছিলাম, ভবদীয় কৃপায় ইহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি।

শ্রীবিহারিচরণ সরকার।

সমস্ত সঙ্কল্পই বদলাইয়া ফেলিতে হইল, এবং সেই সঙ্গে নূতন একটা সমস্যা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইল! আংটির প্রার্থী দুই জনের একজনও আংটির বর্ণনা পত্রে দেন নাই। অথচ বিজ্ঞাপনে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়াই লেখা হইয়াছিল। এ আবেদন বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্যাক করা কৌটা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দুইখানা পো: কার্ড লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া ডাকে পাঠাইতে দিলাম। কি রকম অঙ্গুরীয় খোয়া গিয়াছে তাহা জানাইবার অনুরোধ করিলাম। সে হপ্তার বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের খোয়া যাওয়া আংটির সবিশেষ বিবরণ সহ পত্র লিখিতে অনুরোধ করা হইল।

চারু কর্ম্মকার বা বিহারী সরকারের পত্রোত্তর আসিল না। কিন্তু প্রতিদিনই আমার নিকটে দুইখানি চারিখানি করিয়া অঙ্গুরীয়ের জন্য আবেদনসহ নানাদেশ হইতে পত্র, ও কার্ড আসিতে লাগিল। কোন কোন পত্রে আংটির একটু বর্ণনা দেওয়া থাকিত, কোন কোন পত্রে তাহাও থাকিত না। কিন্তু কোনও বর্ণনার সহিত আমার বিজ্ঞাপন দেওয়া আংটির পুরা মিল হইল না। যদিও অধিকাংশ লোকে তাঁহাদের অঙ্গুলীবিচ্যুত হীরকাঙ্গুরীয়ক যথাসাধ্য মূল্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিতেন, তথাপি কিছু না কিছু প্রভেদ থাকিয়া যাইত। আর যাঁহারা লিখিতেন—আমার অঙ্গুরীয়টিতে খুব বড় একখানা পোকরাজ দেওয়া আছে, কিম্বা পান্না বা চুনিরও কোন উল্লেখ থাকিত, তাহার তো আর কথাই নাই, সেই খানেই চুকিয়া যাইত।

এমনি করিয়া পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, ঝুড়ি করিয়া জমা করিলে প্রায় এক ঝুড়ি চিঠি এই হীরার আংটিটার দাবী করিয়া আসিল। কিন্তু এমন একখানাও চিঠি পাইলাম না যাহাতে আমার ঘাড়ের এই বোঝাটাকে সেইখানে নিক্ষেপ করিতে পারি। শুধু এই দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, বাঙ্গালা দেশের কত লোকই সমুদ্রভ্রমণে গিয়া রত্নাকরগর্ভে রত্ন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন!! বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, প্যাক করা কৌটাটিকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। এ কি এক গ্রহ জুটিল!

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ভৃত্য একখানা কার্ড আনিয়া দিল। তাহাতে একটি খৃষ্টানি নাম দেখিয়া সবিস্ময়ে নিজেই উঠিয়া গেলাম। বাহিরে একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন, ইনি আংটীর প্রার্থী। ইনি গত বৎসর সমুদ্রতীরে একটি আংটি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। সেই জন্য আমার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অবধি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, হয়তো এটি তাঁহারই সেই অঙ্গুরীয়। কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় তিনি এ পর্য্যন্ত ইহার জন্য দাবী করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু আমার এই শেষ বিজ্ঞাপন—"আংটির দাবি অনেকেই করিতেছেন, কিন্তু তাহার একটিও বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াতে কোন দাবি গ্রাহ্য করিতে পারি নাই, পরের জিনিষ লইবার জন্য যাঁহারা নিজের বলিয়া অনায়াসে হাত পাতিতে পারেন, তাঁহাদিগকে ধিক্"—পড়িয়া তিনি আজ এখানে আসিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন জিনিষটি তাঁহার কিনা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার আংটির সোণাটা কি রকম ছিল বলুন দেখি?"

লোকটি আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আমাকে আংটি দেখাইতে কুণ্ঠিত বুঝিয়া তাঁহার ঠোঁটের পাশে একটু খানি করুণার মৃদুহাসি প্রকাশ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "গিনি সোণা, মশাই, আংটিটা সাহেবদিগের ওখান থেকে গড়িয়েছিলুম কিনা, তাই সোণাটা ভালই দেওয়া হয়েছিল।

মনে একটু আশা হইল, তবু আর একটু পরীক্ষার দরকার হইল, "আর হীরা খানা?" "কমল হীরে, চমৎকার হীরে, মশাই, ফাইন কাট্ হীরে।—হীরে খানার আবার একটা ইতিহাস আছে, আমার মা একজন ইউরোপিয়ান লেডি ছিলেন, এ তাঁরি আংটির হীরে। মার স্মৃতিচিহ্ন! পুরাণ আংটিটে ভেঙ্গে যাওয়াতে এই আংটিটে নতুন গড়িয়েছিলুম, তাইতেই তো এই বিপত্তিটা ঘট্‌লো। আংটিটা একটু বড় হয়েছিল ঠ্‌ৎ খুলে জলে পড়ে যায়।"

আমার আর দ্বিধা রহিল না; আংটিটি দেখিলে বোঝা যায় তাহা তেমন পুরাতন হয় নাই, নতুনই বটে। তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বাহির হইতে ভিতরে আংটি আনিতে গেলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আনা ঘটিল না, গৃহিণী বাক্স, ও ট্রঙ্কের চাবি আঁচলে বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি যে এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিয়া আসেন এমন কোন সম্ভাবনা, কোন দিনকার দৃষ্টান্ত দ্বারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উত্যক্তচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। উৎসুক যুবক মনমরা ভাবে; ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন, বলিয়া গেলেন পরদিন আসিয়া আংটি লইয়া যাইবেন।

পরদিন প্রত্যূষে লোক্যাল ডাকেই একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি এই—

"সবিনয় নিবেদন,

এই সপ্তাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া মনে হইল, বিজ্ঞাপনদাতা তাঁহার কুড়ানো

আংটিটির অনেকগুলি প্রার্থী লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাই অনিচ্ছার সহিত কর্ত্তব্য বোধে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কি রকম আপনার এ আংটি? গিনি সোণার এল্‌বার্ট প্যাটার্ণের একটা হীরার আংটি হইবে কি? হীরাখানা এক রতির উপর ওজনে এবং তাহাকে ঘুরাইয়া দেখিলে যেন একটি ছোট গোলাপফুলের মত দেখায়? ভিতরের পিঠে ১০২৫ এই নম্বর লেখা আছে? যদি তাই হয়, তবে সে আংটিটা আমি যে অমূল্য রত্ন রত্নাকর-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি ইহা তাহার অঙ্গুরী, শেষ পর্য্যন্ত তার অঙ্গুলিতে এমনি একটি আংটি ছিল, বেশ মনে আছে।

আপনি দেখিতেছি ভদ্রলোক, আপনার মত লোককে অনুরোধ করিতে সংকোচ নাই। যদি আংটিটি এইরূপই হয়, তবে তাহা ৺রামকৃষ্ণ মিশনের বেনারস সেবাশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন। আমার নিকট আর তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহা যাহার স্মৃতিচিহ্ন, সহস্র হীরকের চেয়েও তাহার স্মৃতি আমার এই চির অন্ধকার চিত্তকে আলোকিত করিয়া আছে। ক্ষুদ্র হীরা সেখানে কি করিবে?

আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন পর লোকে আবার তাহাকে দেখিতে পাই, জগতের মধ্যে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। পত্রে স্বাক্ষর ছিল না বা ঠিকানা দেওয়া ছিল না। বেশ মনে পড়িল আংটিটার নম্বর ১০২৫ই বটে। গৃহিণীকে বেড়াইতে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলাম।

"পরদিন খৃষ্টান যুবকটী আসিয়া ম্লান-মুখে ফিরিয়া গেল।

শীলমোহর ভাঙ্গিতে হইল না, ঠিকানা কাটিতে হইল না, অতি সহজেই আমার ঘাড়ের সেই ক্ষুদ্রাকারের বৃহৎ বোঝাটি সুচারুরূপে নামিয়া গেল।

সেই হপ্তার কাগজে বাহির হইল "আপনার আদেশ মত আংটি সেবাশ্রমে প্রেরিত হইল। ঈশ্বর আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।" শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ভারতে নব সম্রাট।

১

আজি কি আনন্দ ভারত আলয়ে,
নূতন নৃপতি নূতন হৃদয়ে
নূতন ভারতে নূতন সময়ে
এলেন দেখিতে ভারতবাসীরে,
শুভদিন আজ সমগ্র ভারতে,
শুভদিন আজ দরিদ্রগৃহেতে,
শুভদিন আজ দেশেতে দেশেতে,
শুভদিন আজ দরিদ্রকুটীরে।

২

বাঙ্গালী, বিহারী, পঞ্জাবী, দ্রাবিড়ী
অরণ্যনিবাসী অসভ্য পাহাড়ী

দাঁড়ায়ে উৎসাহে আজি সারি সারি
　　কোটী কণ্ঠে গায় শুভ সমাচার,
কোটী কণ্ঠে আজ বিংশ কোটী প্রাণ
কোটী কণ্ঠে আজ হিন্দু মুসলমান,
কোটী নরনারী ধরি একতান
　　গাইছে বারতা নূতন রাজার।

৩

হিমালয় হ'তে কুমারিকা তীর
সমগ্র প্রদেশ, প্রাসাদ, কুটীর
দেখিতে শ্রীমুখ নব নৃপতির
　　আনন্দে, উৎসাহে সবাই অধীর,
সিন্ধু, ভাগিরথী, সরযূ কাবেরী
হিমাদ্রি, অর্ব্বলী, বিন্ধ্য, ঘাটগিরি
　　গায় গুণ আজ নব নৃপতির।

৪

এস ভাই আজ ধরিয়া সুতান
এস ভাই আজ হিন্দু মুসলমান
এস ভাই ছাড়ি মান অপমান
　　এস সবে আজ গাই এক প্রাণে,
গাই তাঁর যশ গাই একবার,
গাই সবে মিলে গৌরব তাঁহার,
গাই শত মুখে বলি বার বার
　　"শুভদিন আজ ভারত-ভবনে"।

৫

শুভদিনে এস নবীন নৃপতি,
শুভদিনে চাও ভারতের প্রতি,
শুভদিনে আজ দুঃখী আর্য্য জাতি
　　আশার আলোক দেখিছে গগনে,
"প্লেগ্" মারীভয় দুর্ভিক্ষ অনলে
কত নরনারী কালের কবলে
কত প্রিয় জনে কাঁদায়ে সকলে
　　গিয়াছে ছাড়িয়া সংসার ভবনে।

৬

এসেছ দেখিতে দেখ তবে তুমি,
দেখ এসে আজ সেই আর্য্যভূমি,
দেখ আর্য্যকীর্ত্তি আর্য্য দেশ ভূমি,
　　দেখ সে প্রাচীন "জুমা মসজিদ"।
পূরব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তরে
হিমালয় হ'তে কুমারিকা-তীরে
দেখ আজ তুমি দেখ আজি ফিরে
মহিমা তোমার গায় সবে আজ।

৭

এলে যদি দেখ রাজভক্ত জাতি
এলে যদি দেখ সবে আজ মাতি
গৃহে গৃহে করে মঙ্গল আরতি,
　　ভারত-গগনে আশার অরুণ,
এলে যদি তুমি দেখে যাও তবে
ভারতনিবাসী দাঁড়ায়ে নীরবে,
এলে যদি তুমি দেখ আজ সবে
　　গাইছে তোমার কত না সুগুণ।

৮

এলে যদি দেখ—ভূটান নেপাল
এলে যদি দেখ সিন্ধিয়া ভূপাল
এলে যদি দেখ অসভ্য সাঁওতাল
　　কহে শুভদিন আজি এ ভারতে,
এহেন সুদিনে কিন্তু হে নৃপতি!
একটী আবেগ হৃদয়ে সবার,
একটী নিরাশা জাগে অনিবার
　　কাঁদায়ে সবারে গৃহেতে গৃহেতে।

৯

জান তুমি সব দেখেছ বৃটনে,

জান তুমি, সব "বেক্সিল" ভবনে
জান তুমি সব কোন্ প্রিয়জনে
হারায়েছি সঙ্গে এহেন সুদিনে,
জান তুমি তাঁরে তোমার আলয়ে
সেদিন বৃটনে ভয় দেহ ল'য়ে
জান তুমি তিনি কত কথা ক'য়ে
কত না আনন্দ লভেন সে দিনে।

১০

জান তুমি তাঁরে, যাঁর তরে হায়!
বৃটননিবাসী বৃটনবেলায়
সমগ্র পৃথিবী যথায় তথায়
ফেলেছে বিরলে কত অশ্রুজল,
তুমিও কেঁদেছ বৃটনে বসিয়া,
কেঁদেছেন "মেরী" আলেকজেণ্ড্রিয়া,
তাঁরে আজ তুমি এখানে আসিয়া
দেখিবে না দুঃখ রহিল কেবল!

১১

তাই আজ তব "নৃপেন্দ্র-নন্দন"
পিতার আসন করিয়া গ্রহণ
তোমারে করিতে আজ অভ্যর্থন
চলেছেন আজ তব দরবারে,
দেখো তবে তুমি নূতন রাজারে
দেখো তবে এই রাজ-পরিবারে
দেখো তুমি তাঁর সন্তপ্তা মাতারে।
দেখো চিরদিন দরিদ্র "বিহারে"।

১২

এসেছ ভালই এসেছেন "মেরী",
এসেছ দেখিতে ভারত তোমারি
দেখে যাও তবু কোটী নরনারী
আদরে তোমারে করেন গ্রহণ,
এমনি আদরে তোমার পিতারে
ভারতের বিংশ কোটী নারী নরে
নানা আয়োজনে নগরে নগরে
করেন তাঁহারে সবে অভ্যর্থন।

১৩

তুমিও, নৃপতি, পিতার মতন
ভারতের দিকে চাওহে এখন,
তুমিও দেখহে ভারত-ভবন
তোমারি দিকেতে রহেছে চাহিয়া,
এসেছ যখন দেখে যাও তবে
উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূরবে
সাগর, ভূধর, নদ, নদী সবে
তব আগমনে উঠেছে জাগিয়া।

১৪

এসেছ যখন দেখে যাও ফিরে,
কহিও সেখানে বৃটনবাসীরে
ভারতের বিংশ কোটী নারী নরে
তোমারে কিরূপ করেছে আদর,
কহিও কিরূপে রাজভক্ত জাতি
পাইয়া তোমারে মহানন্দে মাতি,
ভুলি রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দুর্গতি
গায় তব যশঃ ভারতভিতর।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেলী সাহেব (পরে ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী) ব্রাহ্মদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সুবিচার করেন।

আমার জয়নগর পরিত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে আমি বেলা ১০ টার সময় একদিন জমীদারদিগের কাছারীর সম্মুখ দিয়া স্কুলে যাইতেছি এমন সময় জমীদার "গো…" বাবু এক দ্বারবান্ দ্বারা আমাকে সরকারী কাছারী-ঘরে তাঁহার নিকট ডাকান। তখন তাঁহার কর্ম্মচারীরা এবং জামাই হারাণ বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

"গো…" বাবু। তোমাদের বাপ পিতামহ আমাদের অনুগত ছিলেন, আর তোমরা আমাদের মান না ?

আমি উত্তর করিলাম "আজ্ঞে, আপনাদিগকে আমরাও দেশের জমীদার বলিয়া খুব মান্য করি। তবে ধর্ম্ম সকলের উপর, আপনাদের অনুরোধে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারি না।"

"গো…" বাবু। তোমার বাপ পিতামহ কি ধর্ম্ম করতেন না ? তোমরাই ধর্ম্ম কর।

আমি বলিলাম "আজ্ঞে, তাঁদের বিশ্বাস মত তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং তাহার পুরস্কার তাঁহারা পাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস মত কার্য্য করাই আমার ধর্ম্ম, তাহা পালন না করিলে আমি ধর্ম্ম হইতে পতিত হইব ও ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইব।"

"গো…" বাবু। তোমরা ঠাকুর দেবতা মান না, ব্রাহ্মণদের প্রণাম কর না,—এ সব বড় অন্যায়।

আমি উত্তর করিলাম "মহাশয়, এক ঈশ্বরই উপাস্য দেবতা, আর সব কল্পনা, এ সব হিন্দু শাস্ত্রেই ত আছে। সেই ঈশ্বরের পূজা করিলেই মুক্তি হয়। আর ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ ও সাধু হইলে আমাদের প্রণম্য, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট জাতির বিচার নাই, গুণেরই বিচার।"

"গো…" বাবু। আমরা এদেশের কর্ত্তা জান ? তোমাকে এখন যদি প্রহার করি, তুমি কি করিতে পার।

উত্তর। "আজ্ঞে, যথার্থই আপনাদের কাছে আমরা কিছুই নই এবং আপনারা মনে করিলে সবই করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর সকলের উপর কর্ত্তা এবং আমাদের বিশ্বাস, তিনি মারিলে কেহ রাখিতে, এবং তিনি রাখিলে কেহ মারিতে পারে না।"

"গো…" বাবু। সে যাহা হউক, তোমাকে আর কিছু বলিব না। "—"র সঙ্গে একত্র হইবে না বল।

উত্তর। "তা কিরূপে বলিতে পারি। তিনি সমবিশ্বাসী, তাঁর কি অপরাধে তাঁহাকে ত্যাগ করিব।"

"গো…" বাবু। আচ্ছা আমার একটা কথা রাখ, তাহার বাটীতে আমার অনুমতি ব্যতীত যাইবে না বল।

উত্তর। "আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনাকে না জানাইয়া তাঁর বাটীতে যাইব না।"

"গো…" বাবু। আচ্ছা তাহা হইলেই হইল, তুমি স্কুলে যাইতেছ, এখন যাও।

(ক্রমশঃ)

আমার জীবনের একটী ঘটনা।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল আমি একদিন ঢাকা হইতে গোয়ালন্দ দিয়া কলিকাতায় আসিতেছিলাম। তৎকালে ষ্টিমার সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই নারায়ণগঞ্জের ঘাট হইতে গোয়ালন্দ অভিমুখে যাত্রা করিত এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোয়ালন্দে উপস্থিত হইত। ষ্টিমার উপস্থিত হইবামাত্র হোটেলরক্ষকদের দালালেরা সকলে নদীতীরে আসিয়া যাত্রীদিগের অবতরণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। যাই একজন দুইজন করিয়া যাত্রিগণ নাবিতে লাগিল, অমনি দালালগণ তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কে কাহাকে হস্তগত করিয়া লইবে তাহার জন্য সচেষ্ট হইল। তাহারা প্রত্যেকেই শত মুখে নিজ নিজ হোটেলের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। যাত্রিগণ এইরূপ গোলযোগে পড়িয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। যাহা হউক অবশেষে কেহবা দশ জন, কেহবা পাঁচজন যাত্রী লইয়া নিজ নিজ হোটেলে উপস্থিত হইল। আমিও ইহাদের এক জনের সঙ্গে তাহার হোটেলে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি আমার পূর্ব্বে নানা স্থান হইতে আগত অনেক যাত্রী তথায় আশ্রয় লইয়াছে। আমি তাহাদিগেরই পার্শ্বে একটু আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। উপবেশন করিবার কিছুকাল পরে একজন যাত্রী আসন পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইয়া আমাদের সম্মুখেই বমন করিতে আরম্ভ করিল। আমি প্রথমতঃ মনে করিলাম যে, অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছে বলিয়া লোকটি ঐরূপ বমি করিতেছে। কিন্তু পরে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "আমি পাটনা হইতে আসিতেছি কুষ্টে আসিবার পর থেকেই আমার ভেদ ও বমি হইতেছে।" কুষ্টিয়া ও গোয়ালন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে তখন ওলাউঠার বেশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমি পথিকের মুখে তাঁহার অবস্থা শুনিয়া তিনি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম। ঐরূপ বিপদাপন্ন পথিককে বাঁচাইবার কোন পথ আছে কিনা তাহার

বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম নিকটে কোন চিকিৎসক কি চিকিৎসালয় নাই। পোষ্টাফিসে রুবিনির স্পিরিট অব্ ক্যাম্ফার ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, এই কথা কেহ কেহ বলিল। তখন পোষ্টাফিসের দিকে ছুটিলাম। উচিত মূল্যে এক শিশি ঔষধ ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় একজন ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন "আমার বাড়ী পরবর্ত্তী ষ্টেশন রাজবাড়ীর নিকটে এবং আমি চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকি"। তিনি আমার সহিত হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে আমার অনুপস্থিতিকালে হোটেলে উপবিষ্ট সমস্ত যাত্রী স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। রোগী একাকী পড়িয়া রহিয়াছে। হোটেলরক্ষয়িত্রী উপস্থিত বিপদ দেখিয়া রোগীকে স্থানান্তর করিবার চিন্তা করিতেছিল। আমি যাই ফিরিয়া আসিলাম, অমনি রাগে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রোগী সরাইয়া লইবার জন্য আমার উপর হুকুম জারি করিতে লাগিল। তাহার রাগান্বিত হইবার দুইটী কারণ ছিল। এক কারণ তাহার সকল অতিথি চলিয়া যাওয়া। তাহাতে তাহার অর্থের ক্ষতি হইল। দ্বিতীয় কারণ এই যে সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তাহার হোটেলে আসাতে তাহারও ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ঐ রোগীর ভয়ে অন্য কোন লোক তাহার হোটেলে অগ্রসর হইবে না। যাক, তাহার আমার উপর বিরক্ত হইবার কারণ এই যে সে আমাকে রোগীর নিকটসম্পর্কীয় বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহার সে সিদ্ধান্ত করায় বড় দোষ ছিল না। কারণ সে যখন দেখিতে পাইল যে, আমিই কেবল রোগীর আরোগ্যের জন্য এত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি, তখন সে সেরূপ মনে করিতে পারে। আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম "বাছা! এত আর আমার রোগী নয় যে তুমি আমায় এত কথা বলে ফেল্লে, এও যেমন পথিক, আমিও সেইরূপ। মনে কর যদি কোন আত্মীয়-স্বজন-বিহীন স্থানে তোমার এইরূপ বিপদ ঘটিত, তাহলে তোমাকে কেহ তাড়িয়ে দিতে গেলে তোমার দশা কি হত? এই কথা বলিবার পর তাহার ক্রোধটা একটু প্রশমিত হইল। তখন সে বলিতে লাগিল "দেখুন আমার কি বিপদ, এখনই পুলিশ সংবাদ পাইলে আসিয়া আমাকে বন্দ করিবে, বলিবে 'বেটি! কেন এরূপ রোগীকে স্থান দিয়েছিস।' এই বলিয়া হয়ত আমা হতে কিছু দক্ষিণা আদায় করিবে, না হয় আমাকে থানায় নিয়ে লাঞ্ছনা দিবে। তারপর আপনি স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন যে আমার সব যাত্রী আজ অন্য ঘরে চলে গেল, এতে আমার কত ক্ষতি।" আমি তখন বুঝিলাম তাহার যথার্থই বিরক্ত হইবার কারণ হইয়াছে। যাহা হউক আমরা শীঘ্র শীঘ্র কিছু স্পিরিট অব্ ক্যাম্ফার

রোগীকে সেবন করাইলাম। রোগী তৎপরে আর একবার বমি করিল। তখন আমার সঙ্গে যে ডাক্তার বাবু আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "আমি রোগীকে আমার বাটীতে লইয়া যাইয়া চিকিৎসা এবং সেবাশুশ্রূষা করিব।" আমি দেখিলাম প্রস্তাবটি মন্দ নহে, তখনও গাড়ী ছাড়িবার দুই চারি ঘণ্টা বিলম্ব আছে, এত সময় অপেক্ষা করিতে হইবে ভাবিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। এমন সময় ডাক্তার বাবু বলিলেন "আমি রোগীকে ষ্টেশনে লইয়া গিয়া একখানি ট্রলিতে করিয়া রাজবাড়ী লইয়া যাইব।" আমি দেখিলাম বেশ ভালই হইল, প্রথমতঃ হোটেলরক্ষয়িত্রীর গঞ্জনার হাত এড়াইতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ যে সময়ের মধ্যে ট্রেণে যাইয়া রাজবাড়ী পঁহুছিবে, ট্রলিতে যাত্রা করিলে সেই সময়ের মধ্যে রোগীর যথোপযুক্ত চিকিৎসা আরম্ভ হইবে। আমি আর কোন আপত্তি না করিয়া একখানি পাল্কির যোগাড় দেখিতে লাগিলাম। পাল্কী আসিলে পর রোগীকে তাহার ভিতর শায়িত করিয়া তাহার ক্রীত নূতন কাপড়ের বস্তাটি উহার মধ্যে দিলাম। পাল্কী লইয়া বেহারাগণ অগ্রে ছুটিল, ডাক্তারবাবুও তাহাদিগের পশ্চাতে গমন করিলেন। রোগীকে বিদায় দিয়া আমি একটু নিশ্চিন্ত হইলাম, আর হোটেলরক্ষয়িত্রীর ত কথাই নাই, তাহার মস্তকের যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। আমি রাত্রিকালীন আহারাদির ব্যাপারটা ঐ হোটেলেই সম্পন্ন করিয়া সময়মত ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। টিকিট আমার সঙ্গেই ছিল, সুতরাং আর বুকিং অফিসে যাইতে হইল না। আমি একেবারে আমার নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে যাইয়া চাপিয়া বসিলাম। কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়াই ডাক্তারবাবু ও রোগীকে সেই গাড়ীতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। ডাক্তার বাবুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন "ট্রলি না পাওয়াতে আমি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।" আমি আর তাঁহাকে অধিক কিছু বলিলাম না, কখন গাড়ী ছাড়িবে তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। ইত্যবসরে একজন গার্ড সাহেব আমাদিগের গাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইলেন এবং বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই গাড়ীতে কি একটি কলেরা রোগী আছে?" আমি বিপদ গণিলাম, কিন্তু ডাক্তার বাবুর প্রত্যুৎপন্নমতির বলে তিনি উত্তর করিলেন "না কই একটি লোক দুই এক বার বমি করিয়াছে মাত্র।" গার্ড সাহেব আর বেশী কিছু তদন্ত করিলেন না, ঐ উত্তর শুনিয়াই চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বাবুর এই উত্তর প্রদান করা নীতিবিরুদ্ধ হইলেও আমি তাঁহাকে হীন চক্ষে দেখিলাম না। বরং মনে মনে ভাবিলাম যে, লোকটা পরোপকার করিতে যাইয়া, আপনার আত্মাকে ডুবাইতে কুণ্ঠিত হইল না। সূক্ষ্ম নীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ ডাক্তার

বাবুর তাদৃশ ব্যবহারের যে ভাবেই সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহার ওরূপ কার্য্যে একটি লোক যে আসন্ন টানা হেঁচড়ার হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহার আর ভুল নাই। কিছুকাল পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রোগী এক এক বার মলত্যাগ ও বমি করিতেছেন, কোন পাত্রের অভাবে আমি আমার অঞ্জলিপুটে কাপড় রাখিয়া তাহার উপর সেই মল ও বমি গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বার গাড়ীর দ্বার দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিলাম। আমি আমার হাত ধৌত করিয়া লই এমন কোন বন্দোবস্ত গাড়ীতে ছিল না। এইরূপ করিতে করিতে যখন আমাদের সঙ্গে যে পুরাতন বস্ত্রগুলি ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন রোগীর বিক্রয়ার্থ আনীত বস্ত্রগুলির মধ্য হইতে নব বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাহাই ব্যবহার করিতে লাগিলাম। এইরূপ বিপদাপন্ন অবস্থায় গাড়ী রাজবাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিল। তখন রোগী ডাক্তার বাবুর স্কন্ধদ্বয়ের উপর হস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। ডাক্তারবাবু রোগীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখিবেন রেলের লোকেরা যেন কেহ কোন সংবাদ জানিতে না পারে, সাবধান হয়ে একটু বল করে চলুন।" রোগী ও ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলমান ও আমি ব্যতীত আর সমস্ত যাত্রী ঐ গাড়ী হইতে নামিয়া অন্য গাড়ীতে যাইয়া চাপিয়া বসিল। মরণের ভয়ে ভীত মানুষ যে ওরূপ করিবে বিচিত্র কি? আমি মুসলমান ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কেন অন্য গাড়ীতে গেলেন না?" তিনি উত্তর করিলেন "সমস্ত স্থানই খোদার অধীন, কেহই মৃত্যুর হাত এড়াইতে পার্ব্বে না, যদি খোদার মর্জ্জি হয় তা হলে তিনি আমায় এখানেও রক্ষা কর্ত্তে পারেন, তাহা না হলে অন্য গাড়ীতে গেলেও আমার কলেরা রোগ হতে পারে"। এই বলিয়া তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। রোগীটির পরিণাম কি হইল, তাহা জানিতে পারি নাই। হয়ত তিনি তাহার পথের পরিচিত বন্ধু ডাক্তার বাবুর পরিশ্রম ও শুশ্রূষার গুণে আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার পরিবারে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়াছেন অথবা বন্ধুবান্ধবদিগের অজ্ঞাতসারে অনন্ত কালসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জীবনপথে চলিতে চলিতে এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হয়েন, তাঁহারা মানবপ্রাণের সহানুভূতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে পারেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মানুষ কেবল এক ক্ষুদ্র পরিবারভুক্ত জীব নহে, এই বিশাল মানবসমাজেও তাঁহার স্থান আছে, এবং প্রত্যেক প্রেমিক হৃদয়ই তাহার বন্ধু ও আত্মীয়।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

তীর্থ।

তীর্থ শব্দের অর্থ 'অবতরণ-স্থান।' এক্ষণে যেখানে গমন করিলে অন্তঃকরণ পাপশূন্য হয়, তাহাকেই তীর্থ বলা যায়। পঞ্চপাণ্ডবগণ কাম্যকবনে অর্জ্জুনের সঙ্গবিরহিত হইলে, অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমন হইয়া পড়াতে দেবর্ষি নারদ, পুলস্ত, ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুণিগণ তাঁহাদিগকে নানা সদাচারপূর্ণ তীর্থযাত্রার ফল শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে তীর্থ ভ্রমণরূপ পুণ্য কর্ম্ম করণার্থ আদেশ করেন।

সংসারে শোকাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ভগবল্লীলাসমন্বিত স্থানই একমাত্র সান্ত্বনাস্থল। যেখানে গমন করিয়া দিবা নিশি দেবসেবা ব্রত ভিন্ন অন্য কার্য্য করিবার অবসর মনকে দেওয়া হয় না, সেই পরম শান্তিময় স্থান, তীর্থ নামে অভিহিত।

কিন্তু কাল সকলেরই অপহারক! এখন তীর্থমহিমা পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ পবিত্রতার মূর্ত্তি বলিয়া দৃষ্ট হয় না। সকল তীর্থেই দেবতার পূজার পরিবর্ত্তে কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞানহীন অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরই কেবল প্রভুত্ব দেখা যায়। তাঁহারাই যেন সাক্ষাৎ ভাবে দেবতাস্থানীয় হইতে চাহেন এবং যাত্রিগণ অর্থ দ্বারা সম্যক্‌রূপে উহাদিগকে পুষ্ট করেন, এই বিধান দেওয়া হয়।

আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন ধর্ম্মভীরু ভারতের লোকেরা ইহকাল অপেক্ষা পরকালের সুখ দুঃখের প্রতি অতিশয় মনোযোগী, এজন্য তাহারা সহজেই পাণ্ডাগণের করায়ত্ত হইয়া পড়েন।

এক একটী নিরীহ যাত্রিদল, হৃষ্টপুষ্ট লম্বোদর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণের "দেহি দেহি" শব্দে অস্থির হইয়া পড়েন। এই সকল স্বার্থপর ব্রাহ্মণ শান্তসমাহিত ভাবের পরিবর্ত্তে চিত্তচাঞ্চল্য ও মনে উগ্রভাব জন্মাইয়া দেয়। এই বুভুক্ষু কাকের দল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাত্রিগণকে উত্ত্যক্ত করিয়া তোলে। তাহারা নিজেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশের অবনতি ঘটায়। যদ্যপি ঐ লোকগুলির সাহায্যের জন্য কোন একটা স্বতন্ত্র ভাণ্ডার স্থাপিত হয় এবং তাহাতে যাত্রিগণ যথেচ্ছা দান করেন আর উক্ত দাতব্য অর্থ হইতে উক্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণকে কোন প্রকার সাধু কার্য্যে বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় উভয় পক্ষের মঙ্গল হয়। কিন্তু এ সকল নিবারণের জন্য কোন আইন কানুন কিম্বা শাসনপ্রথার আবশ্যক হয় না, পাণ্ডাগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বেসর্ব্বা; তাঁহারাই ইহার সুব্যবস্থা করিতে পারেন। নানা উপচারে দক্ষিণার বিধি করিয়াও যাত্রিগণের বাসস্থান ও আহারাদির প্রতি উদাসীন না হইয়া যদি তাঁহারা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে কষ্টের অনেক লাঘব হয়।

Wanting from 225 to 232

ভারতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ পুরীও উল্লিখিত অসুবিধা এবং উৎপাতের বহির্ভূত নহে। বরং সমধিক বলিলেও বলা যায়।

অধুনা পুরী সাধারণের শুধু তীর্থস্থান না হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের স্থান হইয়াছে। বিশাল জলধির অনুপম শোভাময় দৃশ্য ও নর্ত্তনশীল তরঙ্গের লীলা দেখিয়া কোন্ মানবাত্মার হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত না হয়? প্রশান্ত মহোদধিতটবাহী বিমল স্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন করিলে কোন্ বলহীন পীড়াক্লিষ্ট প্রাণে শক্তিসঞ্চার না হয়? এই সুপবিত্র তীর্থ পুরীধাম বহু লোকের সমাগমস্থল। ইহাকে স্বাস্থ্যপূর্ণ ও আরামদায়ক করিতে হইলে ইহার যতটা অভাব আছে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

বাস্তবিক নীলাচলের নৈসর্গিক শোভা অতি রমণীয়। যে দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, শ্যামল সুষমায় ধরণীর অঙ্গ সুশোভিত দেখা যায়। প্রাকৃতিক অলঙ্কারে ভূষিতা জন-কোলাহল বিহীন ভূমির শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য অনিমেষনয়নে হেরিয়াও পথিকের প্রাণ অতৃপ্ত রহিয়া যায়, সুখের আকাঙ্ক্ষা এমনি অসীম। এই আড়ম্বর-বিহীন বিধাতার স্বহস্তগ্রথিত শিল্পনৈপুণ্য মহাদুঃখীর প্রাণেও শান্তি আনয়ন করে। কিন্তু মানব যেখানে নিজের ক্ষমতায় দেবতার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেইখানে ত্রুটি দেখিলাম।

পুরীর প্রকাণ্ড শ্রীমন্দিরে অনবরত শত শত স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধের সমাগম হয়, কিন্তু সেখানে আলোকের ব্যবস্থা অতিশয় হীন। বিশেষতঃ জগন্নাথ দেবের দর্শন সন্ধ্যার পরই হইয়া থাকে। মন্দিরাভ্যন্তর এমন ভাবে গঠিত যে, চন্দ্রালোকও সহজে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

দেবতার দর্শনী ও মহাপ্রসাদ বিক্রয় দ্বারা যেরূপ আয় হয়, তদ্দ্বারা অনায়াসে উল্লিখিত অসুবিধার প্রতিকার হইতে পারে। পুরীতে অনেকগুলি সরোবর আছে। শ্বেতগঙ্গা, চন্দন সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি সকল গুলিই বিশেষ বিশেষ তীর্থ। কিন্তু ইহাদের অবস্থা সংস্কারবিহীন, এবং ইহাদের অধিকাংশই শৈবালাচ্ছাদিত, তথাপি কত দেশ-দেশান্তরের যাত্রিগণ এখানে আসিয়া স্নান করেন।

প্রবাহবিহীন অনির্ম্মল সলিলে ভক্তি সহকারে অবগাহন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে যে দূষণীয় নহে, তাহা বলা যায় না। এ-গুলিরও পঙ্কোদ্ধারের প্রয়োজন। বেদান্ত-দর্শনের হিন্দুধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইখানেই দেখা যায়। এখানে সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে একাসনে ভোজন করিলেও অধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মে এমন উদার ভাব কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু, পুরীর মহাপ্রসাদের পর্য্যুসিত অবস্থাকে "পাঁকাল" প্রসাদ কহে। সেই-গুলি উচ্ছিষ্ট, ভগ্ন ও অধৌত মৃণ্ময় পাত্রে আহার করার প্রথাটি কলেরা রোগের যে অনুকূল, তাহা বোধ হয় ভুল নহে।

রেলপথের সুবিধায় এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা

যাত্রিসমাগম অনেক অধিক হইয়াছে। সকল জাতিরই স্ত্রী, পুরুষ, ভদ্র, ইতর, সমুদায় শ্রেণীর লোক ইহপরকালের কল্যাণার্থ সেখানে গিয়া থাকে।

কতকগুলি বাঙ্গালির যত্নে অধুনা তথায় একটি "পান্থনিবাস" ও ভিক্টোরিয়া হোটেল নামক হিন্দু-আশ্রম স্থাপিত হওয়াতে কিছু সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহা যাত্রিগণের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীণ আরামজনক হয় নাই।

যাই হউক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে ও সামুদ্রিক বায়ু সেবনে যেন সকল অভাব ও ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। সে শোভা অবর্ণনীয়। প্রাতে যখন বালতপন লোহিত বর্ণে ও বর্ত্তুলাকারে চক্রবালপ্রান্তে উদিত হয়েন, তখন সত্য সত্যই নীলাম্বুপূর্ণ পারাবারগর্ভ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দ্রুতবেগে বিমানমন্দির শোভিত করেন। তাই ভক্ত কবি স্তুতি করিয়াছেন—

দিব্যশঙ্খতুষারাভং
ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং

যখন সমুদ্রতটে সূর্য্যোদয় হয় ও সমুদ্রবক্ষে চন্দ্রমার জ্যোৎস্না পতিত হয়, তখন বিধাতার সৃষ্টিনৈপুণ্যের ধন্যবাদ না করিয়া কোন্ প্রাণ নিরস্ত থাকিতে পারে? একাধারে এই জগতের পাশাপাশি কত সুখদুঃখের অভিনয় সর্ব্বদাই হইতেছে। "হরি কত ভাবে কত স্থানে করহে বিহার"।

পবিত্র তীর্থস্থানে যেমন ভগবানের বিচিত্র লীলা, তেমনি ভক্তগণের ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শন করিয়া প্রাণ স্বভাবতঃ এক মহান্ ভাবে পূর্ণ হয়। তাহার উপর যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ মোহিত হইয়া যায়, তখন আর শোকের নিদারুণ বেদনা থাকে না।

ভগবানের প্রেমস্রোতের প্রবাহ অকূল সাগরের তরঙ্গের ন্যায় যেমন অবনীর বক্ষে খেলিতেছে, তেমনি মানবহৃদয়েও বহিতেছে। সেই কল্লোল, সেই গর্জ্জন কখন উল্লাসে ফুলিয়া উঠিতেছে, কখন গভীর বিষাদে মগ্ন হইয়া যাইতেছে। বাহিরের চিত্র স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অন্তরের আন্দোলনের বিচিত্রতা অনুভব করিতে পারি।

ঐরূপ স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হওয়ায় তীর্থের মাহাত্ম্য এত অধিক হইয়াছে। এই মাহাত্ম্য স্বার্থপর মনুষ্য কর্ত্তৃক নষ্ট হইতে দেখিলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
সতীলীলা ও মনোজবা-রচয়িত্রী।

ঈশ্বরের উপর নির্ভরে শান্তি।

পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের মধ্য দিয়াই মানবজীবন অতিবাহিত হয়। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, ঝড় ঝঞ্ঝাবাত, আশা নৈরাশ্য, বিচ্ছেদ মিলন, সম্পদ বিপদ, মানব-জীবনে প্রতিনিয়তই চক্রাকারে ঘুরিতেছে। জীবনপথে কত দুঃখ, তাপ, রোগ, শোক ঘৃণা, লাঞ্ছনা, অহর্নিশ মানবপ্রাণকে ব্যথিত করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই বিপদসঙ্কুল জীবনপথে চলিতে চলিতে মানুষ অনেক সময় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জীবনের প্রশ্ন-গুলি ক্রমেই যেন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল প্রশ্নের সু-মীমাংসা করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়া অনেক সময় আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির অতীত হইয়া পড়ে। চতুর্দ্দিকের ঘটনা-স্রোত আসিয়া বিপথে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায়। মানুষ এক প্রকার ফলের প্রত্যাশায় কার্য্য করে, কিন্তু অনেক সময় তাহার বিপরীত ফল ফলে। মনে করে একরূপ, সংসারে ঘটে অন্যরূপ। এই প্রকার বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া জীবন অনেক স্থলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপথে চলিয়া যায়। আমরা অনেক সময় দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় কোন্ পথে চলিব ঠিক করিতে পারি না। জীবনের ঘটনাবলীর অন্ধকারে বিভ্রান্ত হইয়া ছুটা-ছুটী করিতে থাকি। আজ হর্ষ, কাল বিষাদ, আজ আশা, কাল নৈরাশ্য, আজ সুখ, কাল দুঃখ, আজ ঐশ্বর্য্য, কাল দারিদ্র্য আমাদিগকে লইয়া যেন সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে শান্তি কোথায়? এই নানা রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে কোন্ পথে চলিলে আমরা প্রকৃত শান্তি পাইব? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল সময় ঠিক পথ বলিয়া দিতে পারে না। যাহা আপাততঃ মধুর ও সুবিধাজনক, যাহা দ্বারা আপাততঃ বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি, সেই দিকেই আমাদের ইচ্ছা আমা-দিগকে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু ধীরবুদ্ধি সুধীগণ জীবনের প্রারম্ভেই প্রকৃত পথটী খুঁজিয়া বাহির করেন এবং ঠিক সেই পথে চলিয়া প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের জীবনে যে বিপদ সম্পদ, সুখ দুঃখ, পাপ প্রলোভন না আসে তাহা নয়, তাঁহারাও যে জীবনপথে চলিতে চলিতে বিষম সমস্যায় উপনীত না হন, তাহা নহে। কিন্তু বিপদ আপদে, দুঃখে দুর্দ্দিনে, পাপ প্রলোভনে, ধর্ম্মবুদ্ধি তাহাদিগের পথপ্রদর্শকরূপে দণ্ডায়মান থাকে। প্রাণের ভিতরে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বাণী শুনিয়া তাঁহারা সহজ ও সরল পথ ধরিয়া চলেন। সহজ ও সরল পথটী যদিও নিতান্ত অপ্রশস্ত ও তাহাতে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, তথাপি এ পথে থাকিলে প্রাণেশ্বরের

অভয়বাণী সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রাণে থাকিয়া সময় অসময়ে কত আশার কথা বলিতেছেন, কতবার প্রাণের তার নাড়িয়া দিতেছেন, কতবার চক্ষুর সম্মুখে নবীন আলোক ও প্রাণে কত উৎসাহানল প্রজ্বলিত করিয়া দেন। সেই আলোক দেখিয়া সহজ ও সরল পথে চলিলে প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই আলোকের সাহায্যে সংসারের সকল শোক দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, অতিক্রম করিয়া আমরা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। কুটিল ও চক্রপথটী খুব প্রশস্ত। সংসার-চক্রে পড়িয়া যাঁহারা আপাততঃ মধুর সুখ সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভজনক এই কুটিল ও বক্র পথটী অবলম্বন করেন, তাঁহারা পদে পদে আঘাত প্রাপ্ত হন। কুটিল ও কুচক্রী লোক নিয়ত অপরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে ও নিজেকে লাভবান্ ও জয়ী মনে করে। কিন্তু ন্যায়বান্ বিধাতার এমনি বিধান যে, সেই স্বরচিত কূটজালে অবশেষে সে নিজেই আবদ্ধ হয় ও আর তাহা হইতে বাহির হইতে পারে না। তখন তাহার সব কূট বুদ্ধি প্রকাশ পায়। এইরূপে দেখিতে পাই যে, কুটিল ও বক্র পথটী কেবল আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে আকর্ষণ করে।

এখানেই মানুষের বিষম ভ্রম পরিলক্ষিত হয়। মানুষ চায় সুখ শান্তি, কিন্তু গমন করে ঠিক বিপরীত পথে। জাগ্রত ভাবে সরল পথে না চলিলে প্রকৃত স্থানে পৌছান অসম্ভব।

এই বিপদসঙ্কুল সংসারে ধর্ম্মবুদ্ধিই আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। শুধু দুঃখ দুর্দ্দিনে নয়, সুখ, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ সকল অবস্থাতেই প্রভু পরমেশ্বরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তিনি কি বলেন তাহা জানিয়া প্রত্যেক কার্য্যে অগ্রসর হইলে আর ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। বিপদে সম্পদে সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার বাণীই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। একটু গভীর রূপে চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন না করিয়া জীবনের সরল পথটী ধরিয়া চলাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল ব্যক্তিরাই এই সহজ ও সরল পথটী প্রাপ্ত হন। লোকে সৎ ভিন্ন অন্য কিছু লাভ করিবার বাসনা রাখে বলিয়াই তাহাদের জীবনের পথ কুটিল ও বক্র হইয়া যায়। আর যাঁহার চিন্তা ও কার্য্য সকলই সৎ, তাঁহার জীবন যে বিরাগ, বিদ্বেষ ও প্রলোভন জালে জড়িত না হয় তাহা নহে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কোন প্রকার কুটিল অভিসন্ধি না থাকাতে সে প্রলোভনজাল তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।

মহা-আবর্ত্তময় সংসার-সাগরে ভগবানের কৃপা তরণীই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়। যতদিন এই জগতে এই দেহে আছি, ততদিন বিপদ ও প্রলোভন আমাদের পথে আসিবেই আসিবে। ইহা নিবারণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তবে যিনি পরমেশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল

থাকিয়া, ফলাফলের কোন প্রত্যাশা না করিয়া, শান্তচিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া যান, তিনি আর বিপদ প্রলোভনে পড়িয়া ঈশ্বরচরণ হইতে বিচ্যুত হন না। যাহা ন্যায়ানুমোদিত, ধর্ম্মানুমোদিত ও কর্ত্তব্যানুমোদিত, তাহা সাধন করিলেই প্রকৃত সুখ, নিত্য শান্তি এবং যথার্থ আনন্দ লাভ হইতে পারে। ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া সুখের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিলে যথার্থ সুখ, নিত্য শান্তি এবং কোন প্রকার আনন্দ লাভ হইতে পারে না। মন ঈশ্বরমুখী রাখিয়া দুঃখ, শোক, অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারিলে প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার হয়। অনেক সময় আমাদের মনে এই ভাব আসিতে পারে যে, করুণার প্রস্রবণ যিনি, তাঁহা হইতে কেন সংসারে দুঃখ, শোক, অশান্তি, বিচ্ছেদ আসে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া সুধীগণ ইহাই ঠিক করিয়াছেন যে, মানবের চঞ্চল মনকে ঈশ্বরমুখী করিতে দুঃখ, শোক ও নৈরাশ্যের মত আর কিছুই নাই। দুঃখের মধ্যে সুখ, শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, নৈরাশ্যের মধ্যে আশা, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন না থাকিলে এ সকলের মাধুর্য্যই মানব কখন আস্বাদন করিতে পারিত না। বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে চিন্তা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানবচরিত্রবিকাশের জন্য দুঃখ, বিপদ, শোক, তাপ নিতান্ত আবশ্যক। কারণ সুখ সম্পদের সময় মানুষ জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া যায়, মনে করে এই ভাবেই জীবন কাটাইবে। জীবনের যে মহৎ লক্ষ্য ও গূঢ় রহস্য আছে, জীবনকে যে সংযমিত ও নিয়মিত করিয়া পরমেশ্বরের চরণে আনিতে হইবে, এ সকল গভীর প্রশ্ন তখন মনে আসে না।

যখন নানারূপ দুঃখ, কষ্ট ও নৈরাশ্য আসিয়া মানুষের ধূলিঘর ভাঙ্গিয়া দেয় ও স্বকল্পিত আকাশকুসুম নিমেষে উড়াইয়া লয়, তখন দুঃখ, বিপদ, বিচ্ছেদ ও মরণের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্যের উদ্রেক হয়। তখন সে বুঝে যে, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, শান্তি অশান্তি পরিপূর্ণ জীবনের পশ্চাতে আর একটা জীবন আছে, আর একটা উচ্চ লক্ষ্য মানবের আছে, সেই লক্ষ্য সাধনই প্রকৃত সুখ ও শান্তি। এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমাদের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গে এবং আমরা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিখি। তিনি এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমাদিগকে তাঁহার অমৃতময় স্বর্গ রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করেন। সুতরাং দুঃখ, বিপদ, দারিদ্র্যকে তাঁহারই করুণার দান বলিয়া মনে রাখা উচিত। দুঃখের উপর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ, পরীক্ষার উপর পরীক্ষা আসিয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামকে গুরুতর করিয়া তুলিতেছে। এই জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া আমরা তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখি। পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিখিলে মানবশক্তির বিকাশ হয়। বিপদের সময় তাঁহার সাহায্য পাইব বলিয়া আমাদের প্রাণে নূতন বল আসে, কোন

ভয় থাকে না। তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইলে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এই যে তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব, এইখানেই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। তিনি উপযুক্ততা বুঝিয়া যাহার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার জন্য তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে বিচার মনুষ্যের করিবার সাধ্য নাই। মানুষদিগকে তিনি কার্য্য করিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া যাইবে। আজীবন শিক্ষা ও সংগ্রাম করিয়া পরীক্ষাতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত না হইয়া, পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটী হইবে ইহাই জীবনের প্রকৃত সাধনা। তাঁহার করুণাতে নির্ভর করিতে পারিলে জীবনের দুঃখ শোকাবলীতে মানুষকে ব্যথিত করিতে পারে না, পরন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দুর্জ্জয় বল ও শক্তি লাভ হয়। দুঃখ, দারিদ্র্য, বিপদ, সম্পদ কিছুতেই মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না। সকল অবস্থাতেই প্রসন্নভাবে থাকিয়া মানুষ কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে। দুঃখ বিপদের পশ্চাতে, শোক তাপের অন্তরালে সেই করুণার সাগর পিতার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে থাকে। সংসারের পাপ, তাপ, দুঃখ, ক্লেশ, নিত্যনৈমিত্তিক। পদে পদে বিপদ ঝঞ্ঝাবাত আসিবেই, আসিবে, চক্রাকারে সুখ দুঃখ মানবজীবনের অনিবার্য্য ঘটনা। এই সকলে অভিভূত হইলে প্রকৃত কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে নানা বিঘ্ন ঘটে ও প্রকৃত জীবনলাভ হয় না।

কার্য্য, শ্রম, সংগ্রাম, চিন্তা, সকলই আছে, অথচ এই সকলের ভিতরেই শান্তি। যাহার কার্য্য, শ্রম, সংগ্রাম এবং চিন্তা নাই, তাহার শান্তি কোথায়?

প্রকৃত কথা, কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই শান্তি। যথার্থ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া খাটিতে পারিলেই শান্তি। পাপ না করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিলেই শান্তি।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলের মধ্যে মোক্ষই মহাফল। পরমপিতা পরমেশ্বরে প্রকৃত নির্ভরশীল থাকিয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলে জীব এ সংসারে সেই মোক্ষরূপ মহাফলের অধিকারী হইতে পারে।

সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরেই প্রকৃত শান্তি আসে। নির্ভরশীলের এ সংসারে সর্ব্বপ্রকার বিপদ কাটিয়া যায়। এই জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই তাঁহার সেবা করিব ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিলে জীবনের কঠোর পরীক্ষা ও ভীষণ সংগ্রামের ভিতরেও মানুষ প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

শ্রীবিনোদিনী সেন।

ভূত না মানুষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নন্দকের নিরানন্দ।

নন্দকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভূত যখন নীচের দিকে নামিতেছিল, নন্দকও তখন প্রাণপণে ভূতের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা দুইজন পরস্পর হইতে পৃথক হইতে পারেন নাই। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা ধপাস্ করিয়া নৈশ-জলসিক্ত একটি বালুকাস্তূপের উপর পতিত হইলেন। বালুকাস্তূপের উপর তাহাদের জানু পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে অল্পমাত্রই যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা নিজ নিজ জানু উদ্ধার করিয়া লইলেন। তৎকালে মেঘমুক্ত চন্দ্রকলার কিরণচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত হইতেছিল। গভীর গহ্বরের মধ্যস্থিত ধবল বর্ণের বালির স্তূপগুলি রৌপ্য স্তূপ বলিয়া তাঁহাদের মনকে সময় সময় বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। অপর কোন ব্যক্তি হইলে তিনি স্থানটিকে মরণের পর পারে বলিয়াই ঠিক করিতেন। কিন্তু নন্দক তাহা করিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, তিনি স্রষ্টার একটি মনোরম সৃষ্টিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখেই ভূত। তিনি ভূতকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলেন। অমনি ভূতও তাঁহার গায়ের উপর আসিয়া ঢলিয়া পড়িল ও তাহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি কহিল। নন্দক সে কথা শুনিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু শেষে দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেলে নন্দক প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভূত কহিল "নন্দক আমি তোমাকে ভাব-ময়ী ও প্রতিধ্বনির সংবাদ জানাইব। এস এখন আমরা এই বালির নীচে লুকাইয়া থাকি। চণ্ডদেবের লোক প্রতি সপ্তাহে এই পথ দিয়া গহ্বরে নামিয়া যায়, অদ্যই তাহার আসিবার কথা। দিনে এ স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু রজনীতে বিপদের সম্ভাবনা। আবার, চণ্ডদেবের লোক ব্যতীত এ স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিকে আসিতে দেখা যায় না। আমরা লুকাইয়া থাকি, রজনী প্রভাত হইলে যাহা করিতে হয় করিব।" এই বলিয়া ভূত বালির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া নীচে শয়ন করিল এবং বালি দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া নাসিকারন্ধ্র ও চক্ষুর্দ্বয় পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। নন্দক লুকাইলেন না, কাহারও ভয়ে লুকাইয়া থাকা তাঁহার কখন অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ ভূত কাহার ভয়ে লুকাইল তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা

হইতেছিল। নন্দকের নিকট তরবারি ছিল। তখনকার কালে পথে ঘাটে চোর ডাকাইতের ভয়ে সকল লোককে সততই ত্রাসিত থাকিতে হইত ও এই সব কারণে অনেকেই তরবারি বা বন্দুক ব্যবহার করিত। নন্দক তরবারিতে হস্তার্পণপূর্ব্বক কি চিন্তা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ধপাস্ করিয়া একটি শব্দ হইল ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই একটি কদাকার পুরুষ বালির মধ্যে দাঁড়াইল। প্রথমে সে বালির মধ্যে গাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত কাল পরেই আপন পদ উদ্ধার করিয়া লইল ও অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া কহিল 'নন্দক!' নন্দক পলকমধ্যে কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া ঐ কদাকার পুরুষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সেই কদাকার পুরুষ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সে উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল নন্দক, তরবারি সম্বরণ কর, আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না। আমাদের কর্ত্তা চণ্ডদেব তোমাকে বড় স্নেহ করেন এবং আমরাও তোমাকে স্নেহ করিয়া থাকি। তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কে না স্নেহ করিয়া থাকিতে পারে? আমরা তোমার অনিষ্ট করিব না, আমাদের কর্ত্তার সেরূপ আদেশ নাই।

নন্দক এই কদাকার পুরুষের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিতে পারিলেন না। বরং রোষকম্পিত স্বরে তিনি কহিলেন, "রে বর্ব্বর, আমি তোর কথায় কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আবার যদি তুই চণ্ডদেবের নাম জিহ্বাগ্রে আনিস্, তবে আমার এই তীক্ষ্ণ তরবারি তোর বক্ষের উষ্ণ শোণিতপানে কখন বিরত হইবে না।" নন্দকের কথা শুনিয়া সেই কদাকার ব্যক্তি পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "নন্দক, তোমার প্রভুভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি রাগ করিও না, কিন্তু আমাকে বল যে, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে? আমাদের বিশ্বাস ছিল, এ স্থান মানবের অগম্য এবং তদনুসারেই এই বৃহদাকার বালিস্তূপের নীচে আমাদের অতি গোপনীয় সম্মিলন-স্থান স্থাপন করিয়াছিলাম। তুমি এ স্থানে কেমন করিয়া আসিলে? তোমাকে কি কেহ সঙ্গে করিয়া এ স্থানে আনিয়াছে? তাহাই যদি হয়, তবে তুমি যাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তাহাকে দেখাইয়া দাও, আমি তাহাকে গোপনীয় ভাবে হত্যা করিয়া আপনার শত্রু কমাই।"

নন্দক ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "তোমার কি বিশ্বাস"?

কদাকার ব্যক্তি কহিল "আমার বিশ্বাস তোমাকে কেহ লইয়া আসে নাই, তোমার বিবেকই ভাবময়ী ও প্রতিধ্বনির উদ্দেশে তোমাকে এখানে ল'য়ে এসেছে। আমার বিশ্বাস, এখানে আসিতে পারে এমন লোক বাঙ্গালায় নাই। যাহাদিগের পারিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদিগকে পৃথিবী হইতে সরান হইয়াছে।"

নন্দক উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন

"তুমি তোমার বিশ্বাসের অনুরূপ কার্য্য কর"।

কদাকার ব্যক্তি কহিল "বেশ নন্দক, বেশ! তোমাকে এরূপ হাস্য করিতে কে শিখাইল?"

নন্দক—কেন, মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে তোমার নিকট হইতেই শিখিয়াছি।

কদাকার ব্যক্তি - বেশ হে বেশ, বেশ অভিনয় করিয়াছ, এখন এস আমাদের আড্ডা দেখিবে ত এস। আর যদি প্রাণে ভয় হইয়া থাকে তবে থাক, এই বালির স্তূপের মধ্যে যাবজ্জীবন বাস কর। এ ভয়ানক স্থান হইতে বাহির হওয়ার এই একটি মাত্র পথ, অন্য কোন পথ নাই। এই বলিয়া কদাকার ব্যক্তি সেই বালির স্তূপের উপরে দ্রুতপাদবিক্ষেপে হাঁটিতে আরম্ভ করিল এবং অনবরত হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় এক দণ্ড পরে সেই বালির স্তূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে এমন একটি ঢালু স্থানে গিয়া বসিয়া পড়িল যে, সে বসিবামাত্র আপনা আপনিই নীচের দিকে নামিতে লাগিল। গমন করিবার সময় "নন্দক এস", "নন্দক এস" বলিয়া সে অতি উচ্চ স্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

কদাকার ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুরিতে ফিরিতেছিল নন্দকও ততক্ষণ তরবারি-হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে-ছিলেন। যেমন সে ঢালু স্থানে উপবেশন করিল, অমনি তিনিও তরবারি উত্তোলন করিয়া তাহার পশ্চাতে বসিয়া পড়িলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্ সর্ করিয়া গর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তিনি গমনকালে কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত হন নাই। এই কদাকার ব্যক্তি কোথায় যায় জানিবার জন্য তিনি এতই উৎসুক হইয়াছিলেন যে, প্রাণের ভয় তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিতেছিল না। নন্দক সেই কদাকার ব্যক্তির সঙ্গে গহ্বরের মধ্যে আসিলেন। যে স্থানটি পাহাড়ের উপর হইতে পাতালের নিম্নতল স্থান বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, তাঁহারা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চন্দ্রদেব আকাশের মধ্যস্থল হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি উচ্চ পাহাড়ের উপরেও যেমন সরল-ভাবে তরল জোৎস্না বিতরণ করিতে-ছিলেন, পৃথিবীর অতি নিম্নতম স্থানেও সেইরূপ করিতেছিলেন। রজনী দেবীও যেমন আদরে পাহাড় পর্ব্বতের উচ্চ শির-গুলিকে নিহারসলিলে ধৌত করিতেছিলেন, তেমনি সমাদরে পাতালসদৃশ নিম্ন স্থান গুলিকেও স্নাত করাইতেছিলেন। অহো! অনন্ত বিচারপতির কি অপূর্ব্ব বিচার। নন্দক দেখিলেন, তিনি গভীর অরণ্যের মধ্যস্থিত একটি মনোহর লতাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। লতাপত্রনির্ম্মিত মনোহর ঘরগুলির চতুর্দ্দিকে প্রায় পঞ্চাশ হাত ঊর্দ্ধ বালি ও প্রস্তরনির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর। গৃহের মধ্যে ফল ফুলের গাছ-গুলিকে এমন সজ্জিত ভাবে রোপণ করা

হইয়াছে যে, দেখিলে মনের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। স্বচ্ছ সরোবর জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া মন্দ মন্দ বায়ুভরে অগণ্য লহরীমালা দ্বারা সুপবিত্র তটরূপ দেবের তুষ্টি সাধন করিতেছে। নানাবিধ সুপক্ক ফল ও সুমধুর ফুলের গন্ধ সহ বায়ু আসিয়া অন্তরের অন্তরতম স্থল স্পর্শ করিতেছে। নন্দক সাহসী পুরুষ, বিশেষতঃ তাঁহার নিকট তীক্ষ্ণ তরবারি ও সজ্জিত বন্দুক ছিল। তথাপি তিনি সেই অপূর্ব্ব স্থানে গমন করিয়া ক্ষণ কালের জন্য কিয়ৎপরিমাণে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া আপন মনে কহিতে লাগিলেন "ভাবময়ি! প্রতিধ্বনি! জানি না তোমরা কোথায়, কিন্তু তোমাদের সন্ধানের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। এ স্থান কেন, ইহা হইতেও যদি কোন ভয়াবহ স্থানে যাইতে হয়, বিনা আপত্তিতেই যাইব। হয়ত ইহারই কোন না কোন অংশে তোমরা বন্দী থাকিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, আমিত তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেছি না। কিন্তু তোমরা জানিও আমি যেমন করিয়া পারি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবই করিব, নচেৎ—" নন্দক আর চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না। কে উচ্চ কণ্ঠে কহিল "নন্দক! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তুমি যাহাদিগকে উদ্ধার করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহারা এইখানেই আছে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ"।

যে এই কথাগুলি কহিল, নন্দক তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু কণ্ঠস্বর সেই কদাকার ব্যক্তিরই বলিয়া তাঁহার মনে হইল। এইখানে উল্লেখ করা উচিত যে, নন্দক এখানে আসিয়া একবারও সেই কদাকার ব্যক্তির দেখা পান নাই। তিনি বড় বিরক্ত হইলেন এবং সক্রোধে কহিলেন "কে তুই, আমার সম্মুখে আসিয়া কথা বল্"। অন্য দিক হইতে অন্য স্বরে কে কহিল "নন্দক! তোমার আশা, দুরাশা মাত্র"।

আর কোথা হইতেও কেহ কোন কথা কহিল না। নন্দক উন্মুক্ত অসি হস্তে করিয়া সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। লতাপত্রনির্ম্মিত ঘরগুলির নিকটে গিয়া দ্বার সজোরে মুক্ত করিয়া সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক লোকের বাস করিবার চিহ্ন রহিয়াছে। কিন্তু এখন মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। নন্দক প্রতি ঘরের প্রতি কক্ষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু প্রতিধ্বনি, ভাবময়ী অথবা অন্য কোন প্রাণীর সন্ধান পাইলেন না।

তৎপরে তিনি গৃহের প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক বাগান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কাহারও দেখা পাইলেন না। কিন্তু তাহাতেও তিনি অনুসন্ধান হইতে বিরত হইলেন না।

রজনী প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্যকিরণে সুস্থান কুস্থান আলোকিত হইয়া উঠিল। নন্দক অসি কোষে নিহিত করিয়া একটি পুষ্পিত বৃক্ষের তলে উপবেশন

করিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও অনাহারে তাঁহার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, কিন্তু তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, উঠিয়া পুনরায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় সেই পুষ্পিত বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে আহারের উপযুক্ত অতি সুন্দর সুন্দর খাদ্য দর্শনে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এসব কে রাখিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এখানে কেহ না কেহ লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তথাপি এ সব চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে পারিল না। আমসত্ব, কাঁঠালসত্ব, আম শুক্‌নো, আমের মোরব্বা, সুপারীর মোরব্বা, আদার মোরব্বা, কিস্‌মিসের মোরব্বা, নারিকেলের আচার, আদার আচার, হরিতকির মোরব্বা ইত্যাদি দেখিয়া তিনি ক্ষুধানলে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং সেইখানে বসিয়া আস্তে আস্তে সামগ্রীগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। সেইখানে সুমধুর পানীয়ও রক্ষিত ছিল, তিনি তাহাও পান করিলেন। কিন্তু ঐ পানীয় পানের পরই তিনি নিদ্রায় এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, সেই বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া ঘুমাইতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন পুনরায় সন্ধ্যাদেবীর অল্পান্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত আবরিত হইয়া গিয়াছে। নন্দক উঠিয়া পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উন্মুক্ত অসি হস্তে করিয়া আবার সমস্ত রজনী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোন মানুষের কোন চিহ্ন বা কাহারও দেখা পাইলেন না। পর দিবস প্রভাতকালে সেই বৃক্ষতলে তেমনি খাদ্যসামগ্রী দেখিতে পাইলেন ও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া গত দিবসের মত সে দিনও পানাহার করিলেন এবং পানাহারের অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। সমস্ত দিবস একভাবে ঘুমানর পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পূর্ব্ববৎ সমস্ত রজনী মুক্ত তরবারিহস্তে ভ্রমণানন্তর প্রভাতে সেইরূপ পানাহার করিয়া পুনরায় নিদ্রায় মগ্ন হইয়া সন্ধ্যায় জাগ্রত হইলেন। এই ভাবে তাঁহার এক সপ্তাহ অতীত হইল। প্রতিধ্বনি বা ভাবময়ীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সে নিভৃত স্থান হইতে বহির্গমনের তিনি কোন পথও পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে, ভূত কর্ত্তৃকই হোক আর মানুষ কর্ত্তৃকই হউক, তিনি এখানে বন্দী হইয়াছেন। ভূতই হোক আর মানুষই হোক, কোন না কোন পথ দিয়া যে বাহির হইয়া গিয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু সে পথ কোথায়? সাত রজনী অনুসন্ধানেও সে পথের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। এখন উপায় কি? যেমন করিয়া হোক পথের খোঁজ করিতেই হইবে। হয়ত রাত্রির অন্ধকারে সেই গুপ্ত পথ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। তিনি পর দিবস সূর্য্যালোকে

পথের খোঁজ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। রাত্রিযোগে ঘুমাইয়া দিবসে জাগিয়া থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। তিনি চিন্তায় এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না। রজনী প্রভাত হইল। তথাপি নিদ্রার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বৃক্ষমূলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে খাদ্যাদি ছিল, তিনিও দৃষ্টি-মাত্রই তাহা ভোজন করিয়া ফেলিলেন এবং প্রাতাহারের পরই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই পানীয় পান করিয়াই যে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তখন বুঝিলেন। সেই দিন সেই ক্ষণে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন যে, এই পানীয়পানই তাঁহার নিদ্রার কারণ এবং তাঁহাকে দিবা-নিদ্রাতে নিদ্রিত রাখিবার জন্যই এই পানীয়ের সৃষ্টি। নিদ্রাতে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করেন বলিয়াই তিনি তথা হইতে বহির্গমনের পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তখন যেন তাঁহার মস্তক হাল্‌কা হইয়া গেল এবং তিনি সমস্ত বুঝিলেন। সে দিন আর পানীয় বস্তু কিছুই পান করিলেন না। তাহার পর নিদ্রা আর তাঁহার চক্ষুকে স্পর্শও করিল না। তিনি মহা উৎসাহে সমস্ত দিবস অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কত দিন রজনী অতীত হইল, কিন্তু অনুসন্ধানের কোন ফল দর্শিল না। নন্দক নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন, ও ভাবিত হইলেন। প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর পরিণামচিন্তায় তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। প্রতিপালক চণ্ডদেবের কথা ভাবিয়াও তাঁহার মন অস্থির হইতে লাগিল। চণ্ডদেব গোপনে একটি দল গঠিত করিয়া তাঁহাদের ও অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, লোকের কথায় এই-রূপ প্রকাশ, কিন্তু তাঁহার সে কথা তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইল না। নানা চিন্তায় নন্দক ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, এই বাটীর মধ্যেই যে মানুষের লুকাইয়া থাকিবার স্থান আছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখে, লজ্জায়, রাগে, চিন্তায়, অনাহারে ও অনিদ্রায় দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিন রাত্রিকালে হঠাৎ অট্ট অট্ট হাস্যধ্বনিতে সেই অরণ্য মধ্য-স্থিত বিশাল লতা-গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিল। এ হাস্যধ্বনি নন্দকের নিকট অপরিচিত ছিল না। নন্দক ক্রোধভরে কহিলেন "কে তুমি? ভূতই হও আর মানুষই হও, আমার সম্মুখে আসিয়া কথা কও।" নন্দকের কথায় কেহ উত্তর দিল না। কয়েক ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তৎপরে মৃদু মধুর পদশব্দ ও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর নন্দকের কাণে যাইতে লাগিল। নন্দক গম্ভীর স্বরে কহিলেন "কে তোমরা, কোথায় রহিয়াছ? আমার সম্মুখে

আইস। তোমাদের কোনও ভয় নাই এবং তোমরাও আমাকে অভয় প্রদান কর"। অস্পষ্ট পদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার পরই নন্দক দেখিলেন চারি জন লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দেবদত্ত, ভবভূতি ও একজন যুবতী রমণীকে দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন, কিন্তু অধিকবয়স্কা স্ত্রীলোকটিকে চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলেন না। রমণী আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যেই তাঁহারা পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন। তার পর সেই ভয়াবহ স্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

ক্রোধ।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং
ত্যজেৎ॥"—গীতা।

"কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের (অশেষ দুঃখের) এই ত্রিবিধ দ্বার (হেতু) (ইহারা) আত্মার (আত্মজ্ঞানের) নাশক, এই জন্য এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে"।

গীতায় কথিত হইয়াছে যে, রিপুগণের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ এই রিপুত্রয় আত্মার নাশক, কিন্তু আমার মনে হয় এই তিনটী রিপুর মধ্যে আবার ক্রোধ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে—ইহাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং অতি ভয়ঙ্কর শত্রু আমাদের আর নাই। অন্যান্য সমুদায় রিপুকে পরাজয় করা যায়, কারণ, তাহাদের একটা সীমা আছে, কিন্তু ক্রোধের সীমা নাই। ক্রোধ নিজের সীমা ছাড়াইয়াও অন্যান্য রিপুর সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া মনুষ্যকে হিতাহিতজ্ঞানবিবর্জ্জিত করিয়া নরকের চরম সীমায় লইয়া উপনীত করে। কোপন স্বভাব লইয়া যাহার জন্ম হইয়াছে, জীবনান্তসময়েও সে তাহার সেই স্বভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। সকল জিনিষেই অরুচি হয়—আমি লোভী, লোভ করিতে করিতে অবশেষে তাহার প্রতি অরুচি হয়, আমি কামুক, প্রাণ ভরিয়া কামনা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই কামনার প্রতি অরুচি জন্মে। কিন্তু কে কবে শুনিয়াছে যে, অমুকের "রাগে" অরুচি হইয়াছে? বরং মদ্যপায়ীর যেরূপ উত্তরোত্তর মদের পিপাসা বৃদ্ধি পায়, কখন হ্রাস হয় না, অর্দ্ধ ছটাক (half an ounce) হইতে এক ছটাক, এক ছটাক হইতে এক পোয়া, এক পোয়া হইতে অর্দ্ধ সের, পরে সের ও ততোধিক মাত্রায় পরিণত হয়, রাগের

পরিমাণও ঠিক উত্তরোত্তর সেইরূপই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমি জ্ঞানী, বহু ধর্ম্ম পুস্তক, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পাঠ করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি, সভামধ্যে বক্তৃতাদ্বারা ধর্ম্মকথা শুনাইয়া বহুলোকের চিত্তাকর্ষণ করি, "বাহবা," ও "করতালি"-ধ্বনিতে সভাস্থল ধ্বনিত হইয়া উঠে, আমার জ্ঞানের, চরিত্রের, ভাষাপারিপাঠ্যের আলোচনা হইয়া আমাকে বহু উচ্চে তুলিয়া দিতেছে। মহানন্দে বাসায় ফিরিয়া আসি—বাসায় আসিয়া এক পেয়ালা গরম চা (a cup of hot tea) অথবা এক বোতল সোডা-ওয়াটার (soda water) পাইলাম না। আর স্থির থাকিবার উপায় নাই, রাগ আসিয়া আমাকে উত্তেজিত করিল—স্নেহ, ভালবাসা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, লঘুগুরুভেদ, আত্মপরজ্ঞান, ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহলোক, পরলোক, সমস্তই তিলেকের মধ্যে লোপ পাইল, ভীষণ পশুভাব ধারণ করতঃ সামান্য ত্রুটির জন্য গৃহ মধ্যে ঘোর বিপ্লব ঘটাইলাম। শান্তির গৃহে অশান্তির অন্ধকার আসিয়া ছাইয়া ফেলিল। কোথায় গেল আমার এত জ্ঞান অর্জ্জন, কোথায় গেল আমার ধর্ম্মপুস্তকপাঠ, কোথায় রহিল আমার বিজ্ঞান, আমি জগৎকে প্রবঞ্চিত করিলাম, প্রেমের নিকট অপরাধী হইলাম, ভগবানের অপ্রীতিভাজন হইলাম, নিজেও প্রবঞ্চিত হইলাম। বহুচেষ্টায়, বহুসাধনায় প্রাণায়াম দ্বারা আমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে (অন্ততঃ আমার এরূপ ধারণা)। মনকে স্থির করিয়াছি, কিন্তু সেই একজন, আমার কোপন স্বভাবের আলোচনা করিল, আর নিস্তার নাই; মুহূর্ত্তেকের মধ্যে 'প্রাণায়াম' 'একাগ্রচিত্ততা' (Deep-breathing concentration) সমস্তই শূন্যে লীন হইয়া গেল। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া সে দোষ দেখাইয়া দিল বলিয়া তাহার প্রতি রাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া তাহার প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিলাম। সে যতই আপনার হউক না কেন, তাহার অনিষ্ট সাধন করিয়া বসিলাম।

মদ্যপায়ী যেমন পানের ইচ্ছা হইলে মদ না পাইলে অত্যন্ত অস্থির হইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বসে, স্নেহপরায়ণ স্বামী হইয়া সতী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী স্ত্রীকে প্রহার করিয়া বসে, পুত্রবৎসল পিতা হইয়া পিতৃভক্ত উপযুক্ত পুত্রের প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ এবং দুর্ব্যবহার করিয়া বসে —কোপনস্বভাব ব্যক্তিও ঠিক তদ্রূপ। অধিকন্তু যাহার উপর রাগ হইয়াছে তাহার প্রতি রাগ প্রকাশ করিতে না পারিলে, তাহার অনিষ্ট করিতে না পারিলে, অস্থির হইয়া দোষী নির্দ্দোষী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহারই প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয় না। কাহাকেও না পাইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি নিজের শরীরেরও অনিষ্ট করিতে বিরত হয় না।

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি ॥"

ক্রোধ হইতে সংমোহ (হিতাহিত বিবেকাভাব) হয়, সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম (আত্ম-বিস্মৃতি), স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যু হয়।

রাগীর সহবাস পরিত্যাজ্য। রাগীর সহবাসে যে আসিয়াছে, সে নরকগামী হইয়াছে। যথা আমি স্বভাবতঃই নম্র-প্রকৃতি, শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু; শঠতা, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানি না। এমন অবস্থায় যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাকে কোন রাগীর সহিত বাস করিতে হয়, ক্রমশঃ আমাতেও তাহার চরিত্র বর্ত্তিবে (Bad magnatism is sure to corrupt my temper)। কারণ হয়ত একদিন ভ্রমবশতঃ একটী অন্যায় করিয়া ফেলিলাম। পাছে রাগীর নিকট সরল ভাবে দোষ স্বীকার করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া (রাগীর নিকট ক্ষমা নাই) আমার প্রতি দুর্ব্যবহার বা আমার কোন অনিষ্ট করিয়া বসেন, সেই আশঙ্কায় আমি ঘটনা গোপন করিলাম অথবা ধরা পড়িবামাত্র মিথ্যা কথা বলিলাম। এইরূপে মিথ্যা, কথন ও প্রবঞ্চনার অভ্যাস ক্রমশঃ আমার হইয়া গেল—সামান্য ত্রুটিতে রাগীর নিকট ক্রমাগত দুর্ব্যবহার পাইতে পাইতে ও গঞ্জনা সহ্য করিতে করিতে আমিও তিক্ত হইয়া উঠিলাম। ক্রমশঃ আমার নম্র প্রকৃতি তিরোহিত হইয়া ভয়ানক কোপন স্বভাব তৎস্থান অধিকার করিয়া আমাকে চির অশান্তিতে ডুবাইল, আমাকে নরকের পথে লইয়া চলিল। সেইজন্য লোকে হিংস্র জন্তু, চোর, দস্যু অপেক্ষা রাগীকে অধিক ভয় করে ও ঘৃণার সহিত তাহার সহবাস পরিত্যাগ করে। আমরা সাধারণতঃ পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার সময় পাত্র পাত্রীর রূপের, বিদ্যার, চরিত্রের, তাহাদের পিতা বা অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা, বংশমর্য্যাদা অথবা কোনরূপ শারীরিক ব্যাধি আছে কিনা, মোটের উপর এই কয়েকটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া তৃপ্ত হইলেই মহা ঘটা করিয়া "নমঃ প্রজাপতয়ে নমঃ" বলিয়া শুভ পরিণয় ব্যাপার সমাধা করিয়া থাকি। কিন্তু সেই সংক্রামক ব্যাধি "ক্রোধ" সম্বন্ধে একবারও আলোচনা করি না—পরিণামে ইহা হইতে যে কি ভীষণ ফল উৎপন্ন হয়, যে ভুক্তভোগী সেই জানে। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, পার্থিব সুখ সচ্ছন্দতার মধ্যে থাকিয়াও রাগী স্বামীর অসহ্য দুর্ব্যবহারে অহরহ দগ্ধ হইয়া অনেক স্ত্রীকে আত্মহত্যা করিতে শুনিয়াছি। রাগী পিতার উপদ্রবে সন্তানকে চিরজীবনের মত পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। রাগীর বড়ই দুরবস্থা, সকলের নিকট পদে পদে সে প্রবঞ্চিত হয়। কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে বা আলাপ করিতে পারে না—এমন কি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত মিশিতে বা আলাপ করিতে ভীত হয়, সঙ্কুচিত হয়। সে নিজেও চিরজীবন অশান্তিতে যাপন করে, অপরকেও অশান্ত

করে। যে গৃহের কর্ত্তা রাগী, সে গৃহ হইতে শান্তি চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। বাড়ীর সকলেই কর্ত্তার অনুপস্থিতি কায়-মনোবাক্যে কামনা করে। কর্ত্তা বাড়ীতে নাই, সকলে এক স্থানে একত্রিত হইয়া আমোদ, প্রমোদ ও গল্প করিতেছে; কর্ত্তা যেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, ব্যাঘ্র গৃহে প্রবেশ করিলে সকলে যেরূপ অস্থির হইয়া প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, তদ্রূপ সকলে পলাইয়া গেল, গৃহ পুনরায় অশান্তির অন্ধকারে আবৃত হইল। আমি কোন একটী ভদ্র লোকের কথা জানি, তিনি জ্ঞানীও বটেন, সম্মানিতও বটেন, ধর্ম্মজগতেও অনেক কাল বিচরণ করিয়াছেন। যদিও তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু ভয়ানক কোপন স্বভাব বশতঃ ক্রোধে তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইত। তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন. রাগিলে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না, সময় সময় অসুস্থও হইয়া পড়িতেন। একদা কোন কারণে কুপিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সম্মুখে তাঁহার স্ত্রীকে ইতরের ন্যায় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

ক্রোধাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক পীড়া জগতে আর নাই। ইহা বসন্ত প্রভৃতি রোগ অপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক। কোপন-স্বভাব পিতা মাতার সন্তানকেও প্রায়ই এই সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। এই মহাব্যাধিগ্রস্ত সন্তান যে দেশে, যে পরিবারে, যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তথায় ভীষণ অশান্তির বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে। মৃত্যু কেশাকর্ষণ করিতেছে, বংশের দোলা প্রস্তুত হইয়া আছে, বহু চেষ্টায় বহু ঔষধ সেবনে যে নিদ্রাকে পায় নাই, অদ্য সেই নিদ্রা চিরনিদ্রারূপে অযাচিতভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে, ক্ষণকাল পরে সবই ফুরাইবে, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া যাইতে হইবে, ভগবান্ কাহাকেও চিরস্থায়ী কবুলিয়ত Perpetual Lease) দেন নাই, এমতাবস্থায়ও রাগী, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া জ্বালাময়ী জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রিয়জনদের অনিষ্ট সাধন করিয়া তাহাদিগকে চিরদুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বা দ্বিধা বোধ করে না। অতএব হে প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ! আমার এই প্রার্থনা যে, প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত গীতার শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া নিজের ইহ পরকালের মঙ্গলের জন্য, বংশের, সমাজের, জাতির মঙ্গলের জন্য, আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বপ্রযত্নে এই ব্যাধির কবল হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার নিমিত্ত বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ আমাদের উপাসনা, জ্ঞান, বিদ্যার্জ্জন, বেদ পুরাণ, বাইবল, কোরাণ ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, যোগ, প্রাণায়াম সমস্তই মিথ্যা হইবে এবং আত্মনাশ অবশ্যম্ভাবী।

"জনৈক বন্ধু।"

মানবীয় অভিমানের দশ দশা।

১

বালিকা।

রাগ করেছি আজ্‌কে আমি খাবনাত ভাত,
এমনি করে ধূলোয় পড়ে কাঁদবো দিন রাত।
আমার উপর পড়ে দোষ দাদা দিদি করে,
তারা খেয়ে পড়্‌তে যায় আমি থাকি ঘরে।
সারাদিন খাটি আমি মায়ের ফরমাস,
পড়্‌লে খোকা ছাড়ান এসে আমার হাড় মাস।
বাবাকে বল্‌লে বলেন ভাল মেয়ে হবে,
লক্ষ্মী মেয়ে হ'লে পরে দেখ্‌বে প্রাইজ পাবে।

২

পাঠশালায় ১ম বালিকা।

আয় মণি এক দিকে বসি মোরা ভাই,
ক্লাসের পড়া দেখি যাহা ঘরে দেখি নাই।
২য় বালিকা।
যতই কেন পড়ি না ক শিক্ষয়িত্রীগণ
আমাদের মনোনীত করেন না কখন।
গরিবের মেয়ে তায় অসিতবরণ—
পোষাক আসাক নাহি পরনে তেমন।
বাড়ী হতে আসে না ত চাঁদা মনোমত
প্রাইজ টা(ও) দিতে যেন হাত কাঁপে কত।
সুন্দরী ধনীর মেয়ে আগে বাড়াইয়ে
ফুলে(র) তোড়া দিতে দেন মেম জনে গিয়ে।

৩

নবোঢ়া বধূ।

ফুলের সাজে সাজিয়ে দিলে ফুলশয্যার ঘরে,
ভেবেছিনু কথা কবে কতই আদর করে।
তা না হয়ে বলে কিনা "কি বই এখন পড়?"
কি বালাই পড়ার কথায় হই যে জড়সড়।
কেন বাবা এনেছেন বিএ-পাশ বর,
পড়া পড়া করে শুধু জানে না আদর।
তাস কিনে দিবে কোথা, কিনে দিলে বই,
বউ হয়েছি এখন আমি বই(এর) যে কেউ নই।

৪

অধ্যয়নশীলা পত্নী।

জ্ঞানের পিয়াস জানিয়ে তোমার
যতনে খুলেছি হৃদয়ের দ্বার,
কঠোর সাধনা করেছি এবার
জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে।
ক্ষীণবল মোরা হীন নারীজাতি
পাব না কখনো উচ্চ জ্ঞানভাতি
দুঃখ, দৈন্য, রোগ সংসার অরাতি
পাছে ফিরে বাধা আনিতে।
তবু খেদ নহি তব মনোমত
আর পরাধীনা সাধ্য নাই তত,
এবার পুস্তকে হয়েছি বিরত
শরীরে না পারি সহিতে।

৫

বিরহিণী পত্নী।

আজ কাল করে কত দিন গেল প্রত্যাশিত
লিপি এল না,
মম আঁখিনীর রয় না যে স্থির কি করি
উপায় বল না।
এতই অলস, দুই ছত্র লেখা, মনে কি পড়ে
না আমারে?
লিপি যদি পাই কঠোর হইয়ে প্রতিশোধ
দিব তাহারে।
গৃহকাজে মন রহে না ভাবিলে, তাও কি সে
জানে না,
ঘরে এলে আর কব না ত কথা, সে যেন
আমারে সাধে না।

৬

শ্বশুরালয়ে বধূ বিদেশগমনাভিলাষিণী।

কেন দিয়েছেন বিধি রমণীজনম,
চির দিন পরাধীন বিষম শাসন।
গঞ্জনা, লাঞ্ছনা হয় যদি কথা কই,
নীরবে রহিলে বাঁচি যদি সব সই।
পিতৃমাতৃ নিন্দাবাদ সন্তানের স্থানে,
কে হেন সন্তান আছে শুনে কোন্ প্রাণে?
ক্ষুদে ননদিনী তিনি কম পাত্র নন,
দোষগুলি বলে ভাঙ্গেন শাশুড়ীর মন।
কত উপদেশ পতি দিলেন সে দিন,
প্রসন্ন বদনখানি করিয়ে মলিন।
আভাষে বুঝিনু কেহ অতিবাদ দিয়ে
আমার ত্রুটির কথা দেছে বুঝাইয়ে।
সই।
এইবার ছোট বাবু বিদেশ হইতে
আসিলে তাহার সাথে যাও মথুরীতে।
বড় বধূ দোষী নয় ধনীর দুহিতা,
আদরের বউ তিনি প্রথম আনীতা।
তব পতি বিদেশেই রয় বার মাস,
বিষাদেই থাক ভাই না পাও আশ্বাস।
উত্তর।
হা কপাল তাই যদি পতি সহ যাব,
খোকার ঝি মোর সাথে কভু নাহি পাব।
তাকে যদি নাও পাই, পতি রাজি হ'লে
এইবার আমি তাঁর সঙ্গে যাব চলে।
সবাকার মুখনাড়া সহিতে না পারি,
বুড় ঝি অবধি মোরে কথা কয় ভারি।

৭

প্রবাস হইতে প্রত্যাগতা নারী।

খুলে ফেলে নৎ, দিব নাকে খৎ,
আর ত বিদেশে যাব না।
আহা গো আমার খোকার আকার
একবার ফিরে দেখ না।
বিয়ে করে ঘরে কৃতদাসী করে
এনেছিল কি গো বল না।
তোমার মিতাই, ভেবেছেন তাই
পর ঘরে নাই ভাবনা।
পরের গতর, হয় না আদর,
হাওয়া খেতে আসা ছলনা।
কত নাটী খুটী আহারের ত্রুটি
হলেই অনর্থ যত না।
মনিব যেমনি, চাকর তেমনি,
কুড়ের বাদসা দুনিয়ার।
আহার যোগানে, খাটিব সমানে,
(আমি) বাঁদির বাঁদি যেন তাঁর।
খোকা কেঁদে সারা, আমি আধ-মরা,
দেখেও দেখে না হাভাতে।

আপনার খাঁই ষোল আনা চাই,
তোমার যাহোক্ যাহাতে।
নাহি চাই স্বাধীনতা, ভাল জল হাওয়া,
পথে পথে টাকা উড়ে, নাহি পরা খাওয়া।
স্বদেশে থাকিব আমি অনাহারে পড়ে,
খুব শিক্ষা হল মোর রেলগাড়ি চড়ে।
বলুক কহুক সব আপনার জন
মুখ দেখে সব চিন্তা হয় নিবারণ।

৮

কলিকাতায়।
সবে আনে কুন্তলীন সেণ্ট দেলখোস
পার্শী বেনারসী সাড়ী নারীর সন্তোষ।
একান্ত যে না পারে গো জাপানী বসন
দর্জ্জি ডেকে ওড়না সাড়ী জ্যাকেট নূতন,
করে দেয় সযতনে দামী অলঙ্কার,
হয়েছে যা বিবিয়ানা চালের ব্যাভার।
ভিতরেতে পেটি কোট কেউবা পরে সার্ট
গঠনের ঠিক ঠাক্ বডিসের কাট্।
ঠিক বিবিদের মত বলিহারি যাই
আমাদের পোড়া ভাগ্যে কিছুই তা নাই।
কত বাবু গড়ের মাঠে নিয়ে পরিবার
বেড়িয়ে এল, কেউবা যায় পরে থিয়েটর।
কারো পতি সাধে গো ইডেন-বাগে যেতে
বেড়াবেন হাত ধরে মেম সাহেবেতে।
তাও না হয় অত সাধ চুলোয় যাক ছাই,
ভোরের বেলা গঙ্গাস্নান তাও ভাগ্যে নাই।
ঘরের মধ্যে বাঁদি হয়ে মলিন বস্ত্র পরে,
কাল কাটুক যত দিন না যাইব মরে।
সই।
ও বাড়ীর ছেলেদের পূজার সময়
জরির পোষাক দেখে লোকে সারা হয়।
দিন ভোর বাছা মোর কান্নাকাটী করে,
কাপমলা খেয়ে এল বাটীর ভিতরে।
ধার করে ঝুটোজরি পাঁচ টাকা দিয়ে
আমি তারে দিনু বোন পোষাক কিনিয়ে।
বাবু বলেন পরকাল খেয়োনা ছেলের,
লেখা পড়া ঘুচে যাবে চিরটী দিনের।
আবদেরে ছেলে মেয়ে বিলাসিতা শিখে,
অধঃপাতে যাবে সব দিব পড়ে লিখে।

৯

কনের মাতা।
কে বলে গো এমন কথা রাণী আমার কাল,
এমন বা কি সয়ের মেয়ে রাণীর চেয়ে ভাল।
নাই বা হ'ল গৌরবরণ আমার রাণীর রং,
ধরে দেবো আরো কিছু ভাল সে বরং।
পাঁচটী পাশ জামাই চাই বর্ণ পরিষ্কার,
বুজে সুজে খুঁজে আন দেখি এই বার।
ঘরের গাড়ি থাকবে, দোরে থাকবে দরয়ান,
দাস দাসী হাসে হাস, পূজার দালান।
চক্ মেলানো বাড়ী হবে মার্ব্বেলের ঘর,
টেবিল চৌকী থাক আলমারী রবে থরেথর।
ইলেক্ট্রিক পাকা আর আলো ইলেক্ট্রিক
বাড়ীময় চারি দিকে থাকে যেন ঠিক্।
চার দল গড়ের বাদ্দি বর আনবে দোরে,
চৌঘুড়ীতে এলে পরে তুলবে কোলে ক'রে।
কনের পিতা।
এ সবত ছিল সাধ পূর্ণ হল কই,
বিধির নির্ব্বন্ধ যেথা তাই কর সই।
নাই হ'ল ছাই পাশ, আছে জমিদারী,
সাত পুরুষ বসে খাবে না করে চাকরী।
বরের মা।
চোক্ থাকতে অন্ধ হল কর্ত্তাটী আমার,

সোণার চাঁদ ছেলে, এল বউ কদাকার।
কেমনে দেখাব মুখ যা যাউলিগণে,
টাকার লোভ বড় হল সবার চেয়ে মনে।
টাকার তরে মেয়েগুলো পাড়া গাঁয়ে দিয়ে,
বাছারা হল যে সারা ঘর নিকাইয়ে।
ভাগ্য বটে মরাই বাঁধা ধান চাল আছে,
তাই বলে বড়াই করি সবাকার কাছে।

সই।

যা হোক্ তা হয়ে গেছে এখন আবার
ঘরের লক্ষ্মী হলো, হোক্ ভাল ব্যবহার।
প্রাণ ঠাণ্ডা হবে যাতে বাছার তোমার,
ছেলের চেয়ে নিরেশ হ'ল কি কর্‌বে আর।

১০

শ্বশ্রূমাতা।

বড় সাধ করে এনেছিরে ঘরে
পুত্রবধূ আপনার,
সে না কহে কথা, প্রাণে পাই ব্যথা,
কহিলে সুধু ঝঙ্কার।
বড় ভয় পাই, হাড়াই ডোমাই,
কাহারে কহি না সব ;
অতি লাজ পায় শুখাইয়া যায়
পুত্রেও রহি নীরব।
ভাবি মনে মন, করিব যতন,
পতি সম ব্যথী হবে ;
তাওত এখনো কিছুই দেখিনা
রোস রোস বলে সবে।

সই।

এই বেলা সংসার হতে হওগো তফাৎ
নহিলেই অপমান হইবে হঠাৎ।
কাজ নাই সব সাধে বিসর্জ্জন দাও
বেঁচে থাক্ পুত্র তব তুমি সরে যাও।

১১

শ্বশ্রূমাতা।

কি বলে বলিস্ সই হতে গো তফাৎ,
আমার সোণার বাছা বালক নেহাৎ।
তার মুখ চেয়ে আমি সব কাযে থাকি,
বয়স হতেছে বুড়ী হতে নাহি বাকি।
যে কদিন বেঁচে থাকি পুত্র উপার্জ্জিত
অন্ন ছাড়া কারো অন্ন না হয় বাঞ্ছিত।

পিতামহী।

তোরে যেরে বুকে ধরে, সকলি সহেছি ঘরে,
বাছার বাছা রে তুই মোর ;
আর না বকিস্ ধন, তোরা আপনার জন,
কটু বাক্যে ঝরে আঁখি মোর।
ঘর ছেড়ে যেতে কেন, আমারে কহিস্ হেন,
শুনে কাঁদে আকুল পরাণ ;
এই ঘরে দাদা তোর, অন্তিম সময়ে মোর,
বুক ভেঙ্গে করিল প্রয়াণ।
এইখানে মাথা রাখি, মুদিব এ পোড়া আঁখি,
তোরা লয়ে করিবি সৎকার ;
এই শেষ আশা ধন, করোনারে বিড়ম্বন,
পূর্ণ কোরো এসাধ আমার।

নাতি।

এ ঘর ছাড়িতে হবে নহিলে ছাড় বাড়ী,
তোমার যা কিছু আছে সবি লব কাড়ি।
রেখে দাও সাধ, আশা, আদরের কথা
নাতির পাল্লায় বুড়ী, ছেলে তোর কোথা।

বুড়ী।

এইবার অভিমান তুমি যাও সরে,
আমার আমিত্ব যবে বিস্তারিত ছিল ভবে,
তখন পুজেছি হৃদে, এবে আছি মরে,
(যাও অভিমান তুমি এইবার সরে)।

আর নাই কোন সাধ, তবু যে মায়ার বাঁধ
ভাঙ্গে নাই মোর প্রাণে একি রে বালাই।
ভবে(য়) খেলা বাহাদুরি, কিল খেয়ে কিল চুরি
যে পারে করিতে ভবে তার দুঃখ নাই।

(নাতির নিজ দ্রব্যাদি সহ গৃহপ্রবেশ, বুড়ীর কাঁপিতে কাঁপিতে নিষ্ক্রমণ ও নদীতীরে আগমন)

বুড়ী। (সরোদনে)
পৃথিবী দোকাঁক হও, আমারে লুকায়ে লও,
সাধারণ কাহারেও কয়োনা এ কথা।
অথবা গো ভাগিরথী কর অন্তিমের গতি,
সংসারেতে মানবের নাহি যে শীলতা।
স্থান দাও পরমেশ, হর হে সকল ক্লেশ,
হতাশেরে কর শেষ সান্ত্বনা প্রদান।
সংসারের মোহমায়া- পূর্ণ রেখেছিল কায়া,
এবে দেখা দিয়ে তারে কর প্রভু ত্রাণ।
এত দিন তোমা ছাড়ি, পতি পুত্র ধন বাড়ি
প্রধান হইয়াছিল জীবনে আমার।
এখন বুঝিনু সব, সব লীলা খেলা তব,
কার্য্য করে, ঘুরে জীব এ বিশ্বসংসার।
পিপীলিকা হতে হীন, অণুকণা হতে দীন,
কে আমি কোথায় আমি, আমি কেহ নয়।
দুঃখ সুখ কোন্‌টী কি, সবি একাকার দেখি,
যদি হতে পারে প্রাণ প্রভু তোমা সনে লয়।
সাধিতে কর্ত্তব্যভার, দিয়াছিলে এ সংসার,
সকলি হয়েছে শেষ, পথ বলে দাও।
কোথায় যাইতে হবে, আরো কি করিতে হবে,
অথবা সকলি মোর সঙ্গে করে লও।

সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং।

১। পৃথিবীতে অনেক জাতির অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র আছে এবং প্রত্যেক জাতি আপনার শাস্ত্রকেই অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রদত্ত মনে করে। যেমন হিন্দুর বেদ, পারসির যেন্দাভেস্তা, খ্রীষ্টানের বাইবেল, বৌদ্ধের ধম্মপদ, মুসলমানের কোরাণ, এবং শিখের গ্রন্থজী। এইরূপ আরও অনেক জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুশাসক পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ আছে। প্রত্যেক জাতি আপনার শাস্ত্রের দোহাই দেয় এবং সেই শাস্ত্রের শাসন প্রতিপালন করাকে ধর্ম্ম ও লঙ্ঘন করাকে অধর্ম্ম বলে।

২। যে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাস্ত্রের উল্লেখ করা গেল, সে সকল পূর্ব্বে ছিল না, পরে এক সময় বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন শাস্ত্র সকল মানুষের লিখনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে রচিত হয়, এজন্য সে সকল গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই—বহুযুগ যুগান্তর পুরুষপরম্পরাক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতিতে আবদ্ধ ছিল এবং মুখ-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। এরূপ

ভাবে চলিলে শাস্ত্রোক্তি সকল যে বিকৃত, পরিবর্ত্তিত ও নষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি। হিন্দুদিগের মতে বেদ জলগর্ভে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, বিষ্ণু মৎস্য অবতার হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। আবার বেদবাক্য সকল বহুকাল ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ছিল, বেদব্যাস তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত ও বিভক্ত করিলেন। শ্রুতি ও স্মৃতিগত ধর্ম্ম-পুস্তকের যে অবস্থা, অনেক সময় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকলেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। বাইবেল সকল সম্প্রদায়ের একরূপ নহে রোমাণ ক্যাথলিক, গ্রিক, ও প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের লোকদিগের পরস্পরের বাইবেল অনেকাংশে বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় বাইবেল-বচনের প্রামাণিকতা লইয়া খ্রীষ্টান্‌দিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হয়। পরে সকল রাজ্যের বিশপ বা ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ নাইস নগরে একত্র হইয়া বাইবেলের সংস্কার করেন, তাহাতে তৎকাল-প্রচলিত বাইবেলের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিশোধিত হয়। মুদ্রাযন্ত্র পাঁচ ছয় শত বৎসর মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে হস্তলিখিত পুস্তক ব্যবহৃত হইত। "সাত নকলে আসল খাস্ত"। প্রত্যেক নকলের সময় পুস্তক এমন পরিবর্ত্তিত হইত যে অবশেষে মূলের সহিত নকলের অনেক পার্থক্য হইয়া পড়িত। এই জন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই প্রক্ষিপ্ত বচন সকলের এত আধিক্য। গুণবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আপনাদিগের নূতন মত সকল চালাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব ও সনাতনত্ব কিরূপে রক্ষা পায়?

এইত গেল মূল শাস্ত্র সকলের কথা। সেই শাস্ত্র সকলের ব্যাখ্যা আবার কত রূপ! নানা মুনির নানা মত। খ্রীষ্টানদিগের শত শত সম্প্রদায় বাইবেলের এক বাক্যেরই শত শত প্রকার অর্থ করেন। বাইবেল একখানি, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা পুস্তক এত হইয়াছে যে, পুস্তকালয়ে ধরে না। বেদ, উপনিষদ্ ও মনুসংহিতা প্রভৃতিরও টীকা টিপ্পনী অসংখ্য। এক ভগবদ্‌গীতা বৈদান্তিক, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ আপনার আপনার মতানুসারে কত ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাঁহার যেমন বুদ্ধি, বিবেচনা, সংস্কার ও উদ্দেশ্য, তিনি ভগবদ্‌বাক্যকে সেইরূপে খাটাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে লিখিত শাস্ত্রের বিবিধ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে।

উপরি-উক্ত শাস্ত্র সকল যে সত্য, কে তাহার প্রমাণ দেয় এবং কে তাহার বিচার করে? সকল শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে সেগুলি পরস্পরবিরোধী হয় কেন? সত্যে সত্যে বিবাদ হইতে পারে না। যদি সকল শাস্ত্র সত্য না হয়, কোন্‌টি সত্য, কোনটি মিথ্যা? হিন্দু বলিবেন বেদ অমোঘ সত্য, বাইবেল, কোরাণ মিথ্যা। খ্রীষ্টান বলিবেন বাইবেলই একমাত্র ঈশ্বরদত্ত পুস্তক,

বেদ, কোরাণ কল্পিত। মুসলমান বলিবেন কোরাণই সত্য, কোরাণ ছাড়া যাহা তাহা দগ্ধ করিয়া ফেল। কোনও দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা যেমন আপনার জিনিষের প্রশংসা করে এবং অন্যের জিনিষের নিন্দা করে, ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল সেইরূপ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য ও অন্য সকল মিথ্যা বলিয়া রটনা করে।

ফল কথা, এই সকল শাস্ত্রই মনুষ্য-প্রণীত। যাঁহারা শাস্ত্র রচনা বা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া সাধ্যমত তাঁহারই সত্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরের সত্য অভ্রান্ত, কিন্তু ভ্রমপ্রমাদপ্রবণ মানবের বুদ্ধি, জ্ঞান ভাষা ও দেশ, কাল, অবস্থার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হওয়াতে তাহা মলিন ও বিকৃত হইয়াছে। গোমুখী হইতে যে গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা কেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল! কিন্তু যত নিম্নতর ভূমি দিয়া সেই স্রোত চলিয়া যায়, ততই তাহা মলিন ও আবিল হয়। সকল শাস্ত্রই সত্য ও মিথ্যাতে জড়িত, মিথ্যা হইতে সত্যকে বাছিয়া লইতে হইবে।

শাস্ত্রে যাহা মিথ্যা আছে, তাহা বেদ-বাক্য হইলেও অগ্রাহ্য এবং যাহা সত্য আছে তাহা যে দেশের বা যে কালের হউক চিরকাল আদরণীয়। যাহা মিথ্যা তাহা কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, যাহা সত্য, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে হইবে না। ইহার কারণ এই যে সত্য, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অমোঘ বাক্য, মিথ্যা মনুষ্যকৃত, সুতরাং কৃত্রিম ও মনঃকল্পিত কথা। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও হয় না।

জগতের নানা শাস্ত্রে এক সত্য দেখা যায়। বাইবেলে আছে,—Blessed are the meek.—Blessed are the pure in heart. মনুর শাস্ত্রে ধৃতি, ক্ষমা ও দম ধর্ম্মের লক্ষণ। চৈতন্য বলিয়াছেন "তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।" ইহা দেখিয়া অনুদার অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন, এক শাস্ত্রের সত্য আর এক শাস্ত্র চুরি করিয়াছে। খ্রীষ্টান যখন দেখেন তাঁহার বাইবেলের সত্য গীতায় আছে, তিনি বলেন গীতা বাইবেল হইতে এ বচনটী অপহরণ করিয়াছে। এইরূপ হিন্দুও তাঁহার শাস্ত্রের কথা বাইবেলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হন ও তাহা হিন্দুশাস্ত্র হইতে নিশ্চই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পক্ষপাতিগণ সত্য লইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদ করেন। এক ময়রার দোকান হইতে দশ জন ফড়ে মিষ্টান্ন লইয়াছে, তাহা একরূপ বলিয়া কেহ কাহারও জিনিষ চুরি করিয়াছে বলা যায় না। সত্য সম্বন্ধেও সকল জ্ঞানী লোকের একমত। ইহাতে এই মনে করিতে হইবে যে, সত্যের আকর এক ঈশ্বর হইতে সকলেই সত্য পাইয়াছেন, এই জন্য সত্য সর্ব্ববাদি-সম্মত। Comparative Philology

(ঔপমিক শব্দশাস্ত্র) যেমন সকল ভাষার মধ্যে অনেক শব্দের ঐক্য প্রদর্শন করিয়া তাহাদের এক মৌলিক ভাষা নির্ণয় করিয়াছেন, Comparative Theology (ঔপমিক ধর্ম্মশাস্ত্র) সেইরূপ সকল ধর্ম্মের মধ্যে সত্যের ঐক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের এক নিদান অবধারণ করিবেন।

সকল ধর্ম্মের সার সঙ্কলন করিলে এক মূল ধর্ম্ম দেখা যায়। ঈশ্বর-ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-পরায়ণতা, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি বিষয়ে সকল ধর্ম্মের একই প্রকার উপদেশ। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে,সত্য সার্ব্ব-ভৌমিক, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে ইহা আদর-ণীয়, সুতরাং ইহা নিত্য। ব্রাহ্মের উপাস্য দেবতা সত্যস্বরূপ ঈশ্বর যেমন নিত্য, ব্রাহ্মের শাস্ত্রও সেইরূপ নিত্য। ঈশ্বর যেমন অনন্ত, সত্য এবং শাস্ত্রও তেমনি অনন্ত। সত্যের আকর পরমেশ্বর আপনার আলোকে সত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং মানব সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছে। সত্য বিজ্ঞানের হউক, দর্শনের হউক, অর্থ তত্ত্বের হউক, পরমার্থ তত্ত্বের হউক, সকলই ঈশ্বরের সত্য। সুপণ্ডিত অক্ষয় কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যথার্থ বলিয়াছেন ;—

বেদ ও পুরাণ, বাইবেল ও কোরাণে যে কিছু সত্য আছে, তাহা আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্যাস ও বাল্মীকি, গৌতম ও কণাদ, সক্রেটিস ও বেকন যে কিছু সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম, ভবিষ্যতে যে কোনও দেশে যে-কোনও মহাপুরুষ যে কোনও সত্য প্রকাশ করিবেন, তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে ঃ—(১) ব্রহ্মাণ্ড, (২) মানবপ্রকৃতি এবং (৩) মানব ইতিহাস। ব্রহ্মাণ্ড ইহার বেদ, মানবপ্রকৃতি ইহার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান এবং মানব ইতিহাস ইহার পুরাণ। জড় জগত হইতে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শারীর বিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, যত সত্য শিক্ষা দেয়, তাহা বৈদিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি এবং আত্মতত্ত্ব হইতে যে সকল গভীর আধ্যাত্মিক সত্য লাভ হয়, তাহা যত্নপূর্ব্বক আহরণ করিতে হইবে।

মানবজাতির উত্থান, স্থিতি, উন্নতি, এবং পতনে যে ভগবল্লীলা, তাহা পৌরাণিক সত্য বলিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সত্য অনন্ত গুরুর মুখ হইতে নিয়ত উপদিষ্ট হইতেছে। এ শাস্ত্রের শেষ কোথায়, বিনাশ কোথায় ?

মনুষ্যকৃত শাস্ত্র সকল ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং নশ্বর। কালে কালে তাহার সংশো-ধন করিতে হয়। দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া আছে, তাহা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, অথবা এক মহাশাস্ত্রের মধ্যে নিবিষ্ট হইবে।

সকল সত্য লইয়া ঈশ্বরের যে এক মহাশাস্ত্র তাহাই অবিনশ্বর, তাহাই চির-সত্য। পরিণামে পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি এই শাস্ত্রকেই আপনাদিগের মহাশাস্ত্র বলিয়া চিনিয়া লইবে। তখন হিন্দুর সত্য, বৌদ্ধের সত্য আর পৃথক্ ভাবে পূজিত বা অবহেলিত হইবে না। সকল জাতির সকল শাস্ত্রের সত্যরত্ন সকল "সূত্রে মণি গণাইব" (এক সূত্রে গ্রথিত মণিমালার) ন্যায় শোভা পাইবে এবং সমগ্র মানবজাতি আনন্দে তাহাই কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

এক্ষণে আমরা মানবজাতির মধ্যে নানা বিষয়ে ঐক্য ও যোগ দেখিতেছি। বে শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি এক জাতির, ক্রমে তাহা সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইতেছে। ঐশিক বিধানে ধর্ম্মের সত্য সকলও এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইবে। তখন আর মানবজাতির মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবাদ থাকিবে না। এক ঈশ্বর সকল মানবের পিতা মাতা এবং সকল মানব পরস্পরের ভাই ভগিনী, এই মহা সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে এবং সত্যের ও ঈশ্বরের মহিমার জয় হইবে।

মার্‌সী মার্‌ভিল্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাদ্‌রী আনষ্ট্রুথার যখন ক্র্যানবয়েন প্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে তাঁহার মন গভীররূপে সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। হয়ত গ্রামবাসিগণের ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থ লেডি মেরির নিকট কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা পাগলের প্রলাপের ন্যায় উপেক্ষিত হইবে। হয়ত লেডি মেরি তাঁহাকে একজন দাম্ভিক, অবিবেচক ও নিতান্ত নির্ব্বোধ লোক বলিয়া মনে করিবেন। এইরূপ নানা নিরুৎসাহজনক চিন্তা তাঁহার মনে উপস্থিত হওয়াতে তিনি এতাধিক হতাশ হইলেন যে, ক্র্যানবয়েন প্রাসাদপ্রঙ্গণে আর এক পদও অগ্রসর হইতে তাঁহার মনে সাহস হইল না। লেডি মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কিনা সে সম্বন্ধেও এক্ষণে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! তাঁহার আদেশবাণীর দ্বারা যে ব্যক্তি আশৈশব পরিচালিত, তাঁহার আজি এ কি অবিশ্বাস! যে ধর্ম্মযাজক নির্ভীকচিত্তে ভগবানের কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে পবিত্র ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ ধারণ করা যে অতিশয় অন্যায় তাহার কোন সন্দেহ নাই। পাদরী

আনষ্ট্রথার আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, ভগবানের কার্য্যে আজ তাঁহার নির্ভীকতার অভাব দর্শনে যেন মস্তকোপরি পবিত্র সুনীল নভোমণ্ডল, ও সৌন্দর্য্যের আকর প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছেন। তাহার পর, অধিক বিলম্ব করিলে পাছে তাঁহার মন আরো নানা আশঙ্কা ও চিন্তায় সমাকুল হইয়া উঠে, এবং অভীষ্ট উদ্দেশ্যসাধনে সমূহ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, সেই জন্য তিনি সবলে মন হইতে সকল সংশয়, সকল দ্বিধাভাব দূর করিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে ক্র্যানবয়েন প্রাসাদের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যে কার্য্যের জন্য তিনি লেডি মেরির সাহায্য ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন সেজন্য তিনি উপহাসের পাত্র না হইতেও পারেন, কিন্তু নিশ্চয়ই ভর্ৎসনার পাত্র হইবেন।

ক্র্যানবয়েন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রধান ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেডি মেরি কি এক্ষণে প্রাসাদে একাকিনী অবস্থান করিতেছেন?" তিনি লেডি মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। লেডি মেরির ভৃত্য তাঁহার কথার উত্তরে বলিল—"না মহাশয়, লেডি মেরি এক্ষণে একাকিনী নহেন। তাঁহার সহিত লেডি পমরয়, লেডি পমরয়ের ভ্রাতা ও মিষ্টার টমসন এক্ষণে প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।"

প্রধান ভৃত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি লেডি মেরির সহিত সম্পূর্ণ নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, অন্যের উপস্থিতি তাঁহার কার্য্যকে অধিকতর কঠিন ও বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিতে পারে। প্রধান ভৃত্য তাঁহাকে লেডি মেরির বৈটকখানা-গৃহে লইয়া উপস্থিত হইলে, লেডি মেরি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"মিষ্টার আনষ্ট্রথার, আপনার দর্শন এই প্রাসাদে এখন এত দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে কেন? আপনাকে ঠিক যেন একজন নবাগত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতেছে। এই পল্লীর দীন জনেরা আপনার সময় ও চিন্তাকে এতদূর অধিকার করিয়াছে যে, আপনি যেন আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।"

পাদরী লেডি মেরিকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন—

"আমি সত্যই কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই জন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি গ্রামবাসীদের মধ্যে মৃত্যু ও পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই জন্য প্রায় সকল সময়েই আমাকে কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

তৎপরে তিনি গৃহমধ্যে অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। সদ্ভাবাপন্ন ও সরলচিত্ত লেডি পমরয় পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে যেরূপ ইলষ্টেলবাসিগণের উন্নতি সম্বন্ধে নানা উপায় প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে

আমোদ প্রদান করিতেন, এবারেও সেইরূপ করিলেন। তৎপরে লেডি মেরি তাঁহাকে চা পান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

"আসুন, মিষ্টার আনষ্ট্রথার, আপনি অবশ্য চা পান করিতে আপত্তি করিবেন না।"

পাদরী বলিলেন—"আপনাকে ধন্য বাদ। আমি চিরদিনই চা পান করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সম্প্রতি আমি চা পান একরূপ পরিত্যাগই করিয়াছি।"

লেডি পমরয় তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ওঃ! আপনি কি দৃঢ়মনা ব্যক্তি! কোন লোক চা পান পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা কল্পনা করাও অত্যন্ত কঠিন। আপনি জানেন, আমার ডাক্তার আমাকে একেবারে চা পান পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।"

নূতন সংবাদ।

বিগত ২২শে অক্টোবর জর্ম্মনীর অন্তর্গত হানোভার নগরের নিকট টাকস্ নামক একজন ব্যক্তি পুষ্পক রথ (air-ship) হইতে হঠাৎ পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত এই পুষ্পক-রথ সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনায় ১০০ একশত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

২। আসামের "টাইম্‌স" পত্রে এই-রূপ প্রকাশ যে, শিবসাগরের অন্তর্গত কাজিরাঙ্গা গ্রামে গুজানামক এক ব্যক্তির স্ত্রী পঞ্চমাস গর্ভধারণের পর একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই শিশুটির চারিটী হাত, চারিটী পা, চারিটী কাণ, দুইটী নাক, কিন্তু মস্তক একটী মাত্র। চিকিৎ-সক মহাশয় এই শিশুটীকে আরকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন।

৩। রুশিয়ার সম্রাজ্ঞীর রুমাল সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক মূল্যবান্। উহার কারু-কার্য্য অতীব মনোহর। তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় সাত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মূল্য নূনাধিক এক সহস্র পাউণ্ড অর্থাৎ পনর হাজার টাকা।

পুস্তকসমালোচনা।

মহাভারতীয় নীতি কথা (আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব)—প্রথম খণ্ড, মূল্য ৸৹ (বার আনা) মাত্র। ৺মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া লেখক নিজ সরল ও সুললিত ভাষায় পুস্তকখানি রচনা

করিয়াছেন। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। সুবিপুল মহাভারত গ্রন্থ বালক বালিকাদিগের পাঠের অনুপযোগী। মহাভারত হইতে অনেকগুলি নীতিগর্ভ উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বালক-বালিকাদিগের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসিমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশ্বাস যে, যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। ইহা দ্বারা বালক-বালিকাদিগের চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হইবে, সেইরূপ তাহাদিগের চরিত্রগঠনেরও সহায়তা হইবে। পুস্তকখানি সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। সরলমতি বালকবালিকাগণ আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশার স্থল, তাহাদিগের উপযোগী এইরূপ নীতিপূর্ণ পুস্তক নিতান্ত আবশ্যক। পুস্তকখানি প্রত্যেক বালক ও বালিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকা উচিত। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল কাঞ্জিলাল বি, এল, প্রকাশক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং প্রাপ্তিস্থান —গুরুদাস চাটুর্য্যের লাইব্রেরী ও মজুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা।

বামারচনা।

সংসার।

১

যখন এসেছি প্রভো সংসারে তোমার,
তখনি ত আছে জানা,
হেথা চির থাকিব না,
দু দিনের তরে সুধু আমার সংসার।

২

যেতে হবে এক দিন জানি তা'নিশ্চয়,
তবে কেন এর তরে,
পরাণ এমন করে?
কেন তব পদে মন বাঁধা নাহি রয়?

৩

সংসারের তুচ্ছ সুখে মত্ত কেন মন?
কেন সংসারের দুঃখে,
শত বজ্র বাজে বুকে?
সংসারের সকলি তো অলীক স্বপন।

৪

কেন হয় দুঃখে তাপে কাতর অন্তর?
এক দিন যাব চ'লে,
আগেই তা দেছ ব'লে,
তবে কেন এত টান সংসার উপর?

৫

এসেছি পথিক আমি সংসারপ্রবাসে।
দুদিনের তরে কেন
এ মোহে ডুবিগো হেন?
দু দিনের তরে কেন এত সাধ আসে?

৬

অলীক স্বপন সম সংসারে সকল।
এই আছে, এই নাই,
এই আশা, এই ছাই
ক্ষণেক আনন্দ, ক্ষণে আঁখিভরা জল!

৭

বলে দাও দয়াময় কেন হেন হয়?
আমারে এমন কো'রে
কেন বাঁধ মায়া ডোরে?
আমি ত গো সংসারের কারো কেহ নয়।

৮

ক্ষুদ্র অণুকণা প্রায় আছি এক পাশে,
তবু এ হৃদয় হেন
আকাঙ্ক্ষাপূর্ণিত কেন,
কেন নিরালায় বসি কাঁদি বা হতাশে?

৯

সংসার তো নহে মম চিরবাসস্থান,
কর্ম্মফল পূর্ণ হলে,
নিশ্চয় তো যাব চ'লে,
তার তরে দিবানিশি কেন কাঁদে প্রাণ?

১০

বল দাও ভগবন্! অন্তরে আমার,
যে ভাবে যেথায় থাকি,
তোমারে হৃদয়ে রাখি,
তব নামে হৃদে বো'ক শান্তি পারাবার।

১১

তোমার আদেশ যাহা করিয়া পালন,
স্মরিয়া তোমার নাম,
যাই যেন প্রাণারাম!
তব প্রেমে সদা যেন থাকি নিমগন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

প্রার্থনা।

দেব, কবে হবে মম কার্য্য সমাধান,
কবে পাব তব চরণেতে স্থান?
জগতের শত ঘৃণা উপেক্ষায়,
দুর্ব্বল এ প্রাণ কেঁপে উঠে হায়,
যবে, অশান্তি অনলে হৃদি জ্বলে যায়,
সে সময় বল দিও দয়াময়।
প্রভো, কত দিনে হবে জ্বালা অবসান,
সাঙ্গ হবে কবে এ বিষাদ-গান?
সারা বেলা যায় মিছা খেলা করে,
নিশা কেটে যায় স্বপনের ঘোরে।
এই করে কি গো শুধু বয়ে যাবে
অভাগিনী কভু শান্তি নাহি পাবে?

দেব, আর কত দিন এমন করিয়ে
শিরে লয়ে বোঝা বেড়াব ঘুরিয়ে?
বড় দীর্ঘ পথ না পারি হাঁটিতে,
শিরে লাগে ভার পারি না নামাতে,
নামাবার স্থান নাহি গো হেথায়,
ও চরণ বিনা তব দয়াময়।
আঁধার এ পথ দেখিতে না পাই,
শিহরে গো প্রাণ বড় ভয় পাই,
দাও ত্বরা করে ভেঙ্গে এ স্বপন,
দয়া করে দেব দাও দরশন।
দুর্গম এ পথ একা আমি যাই,
সাথে যেতে সখা সাথী কেহ নাই।

পাথেয় যা কিছু ছিল গো অঞ্চলে,
ফেলেছি হারায়ে এ ঘোর তাড়নে।
আমি বড় দীনা সম্বলবিহীনা,
গতি নাই প্রভো তব স্নেহ বিনা।

হও মম সাথী ওহে বিশ্বপতি,
দাও এ আঁধারে জ্বালি তব ভাতি,
পথহারা আমি লহ হাত ধরে,
অভাগা তনয়া এই ভিক্ষা করে।

ইন্দুবালা।

নিবেদন।

যদি আসিবে না হে মোর দেবতা,
আমার ভগ্ন কুটীরে
যদি তুলিবে না তুমি একটি ঝঙ্কার
নীরব মর্ম্ম মাঝারে,
যদি আরতি আমার নিভিবে হেলায়
অর্ঘ্য আমার শুকা'বে,
যদি কবিতা আমার রহিবে স্তব্ধ
প্রাণের তন্ত্রী ছিঁড়িবে,
যদি আসন আমার ধূলায় লুঠাবে
মন্দির রবে গো শূন্য,
যদি সবার মাঝারে হিয়ারে আমার
করিবে মলিন ক্ষুণ্ণ,
যদি প্রাণের এ গীতি উঠিয়া থামিবে
নিঃস্ব করিতে আমারে,
যদি আমারি সোণার ছোট সে তরণী
ডুবা'বে ক্ষিপ্ত পাথারে,

তবে শেষ করে দাও জীবনের মম
পুলক জ্যোৎস্না যামিনী,
তবে ভেঙ্গে দাও ওগো প্রাণের বন্ধন
বজ্র আঘাতে আপনি।
যবে ক্ষুদ্র হৃদয় কাঁদিয়া ফিরিবে
আঁধার নীরব কক্ষে,
আসি শান্তি সলিল ঢালিও ক্ষণেক
আমারি শিথিল বক্ষে।
যদি হৃদয়ের মম পূজা আবেদন
সকলি করিবে ব্যর্থ,
তবুও তোমারি চরণরেণুকা মম
চির সাধনীয় তীর্থ।
যদি আসিবে না তুমি নিশীথে প্রভাতে
মন্দির রবে গো শূন্য
আমি স্মৃতিপটে আঁকি মোহনমূরতি
করিব জীবন ধন্য।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

আমার দেবতা।

স্বপন আমার টুটিল যে দিন
হে মোর নিঠুর দেবতা!
গেছিনু সেদিন শুনা'তে তোমায়
মর্ম্মের গভীর বারতা। ১।

নিভন্ত আমার দীপটী প্রাণের
উঠেছিল পুনঃ জ্বলিয়া
জীবনের এক পুণ্য প্রভাতে
তোমারি আরতি লাগিয়া। ২।

হে মোর সুন্দর, হে মোর বরণ্যে,
হে চির-উপাস্য দেবতা,
কামনা বাসনা হেরিনু সে দিন
তোমার চরণে লুণ্ঠিতা। ৩
সেদিন আমার বীণার রাগিণী
উঠেছিল মৃদু ঝঙ্কারি,
নীরব প্রাণের একটি সঙ্গীত
দিয়েছিল (আহা) ভুবন ভরি। ৪।
রজনী যখন আসিল নামিয়া
সন্ধ্যার নিবিড় আঁধারে
ক্ষুদ্র সে পূজার উপহার লয়ে
দাঁড়ায়ে রহিনু দুয়ারে!! ৫।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

আত্মীয়।

(১)

হে চিত্ততোষণ প্রিয় হৃদয়বল্লভ!
তুমি নাথ! মোরে কত, ভালবাস অবিরত,
নিত্য দেব! থাক মম হৃদয় ব্যাপিয়া।
আমি তো ভুলিলে তুমি যাও না ত্যজিয়া।

(২)

মোর সুখে সুখী তুমি ওহে প্রাণময়!
তব মহা এ বিভব, আমারে দিয়াছ সব,
তোমার ঐশ্বর্য্য সদা ভোগ করি আমি।
তুমি তো কর না ভোগ হে অন্তর-স্বামী!

(৩)

ভালবাস কত মোরে, জীবনসর্ব্বস্ব!
যখন যেখানে থাকি, সকাতরে যদি ডাকি,
হৃদয়-নিলয় হ'তে তুমি গো তখনি;
স্নেহভরে সাড়া মোরে দাও তো অমনি।

(৪)

এত ভালবাস মোরে তুমি প্রিয়তম!
এমনি কৃতঘ্ন আমি, তোমা ভুলি দিবা যামি,
ব্যস্ত থাকি পরে লয়ে আত্মীয় ভাবিয়া।
তারা তো কাঁদায়ে মোরে যায় গো চলিয়া।

(৫)

ব্যাকুল তাদের হ'য়ে ডাকি বার বার।
সাড়া তো দেয়না আর, নাহি আসে পুনর্ব্বার,
তুমিই ব্যাকুল হৃদে কর শান্তি দান।
কে মোর ব্যথার ব্যথী তোমার সমান?

(৬)

বিপদে সম্পদে তুমি থাক মোর কাছে।
এ হেন আত্মীয় আর, কোথা আছে কে আমার?
অনিত্য পরেরে ভুলে বলি আত্মপ্রিয়।
সত্য-নিত্য-প্রিয় তুমি হে চির-আত্মীয়!

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

"শুভ-আগমন।"

হে রাজন্!
আজি এই শুভযোগে তব আগমনে,
প্লাবিয়া উঠিছে ধ্বনি হরষ সঘনে!
গভীর নিনাদে হেন,
আনন্দ উৎসব যেন
ঘোষিছে বারতা মরি, সুমধুর রূপে
কি দিবে যে উপহার তব-পদ মূলে ১।
আছে হেথা মানবের হৃদয়ের ধার
প্রীতি, ভক্তি, জয়োল্লাস, সর্ব্বগুণসার!
তাই আজি তব লাগি
মধুর মূরতি আঁকি,
নানা উপাদানে "দিক্" করিল শোভন!
কি আনন্দ কি আনন্দ ভারত-ভুবন! ২
যে বিশ্ব-নিয়ন্তা প্রভু বিশ্বের রাজন্,
করেছে ধরার মাঝে তোমারে সৃজন্,
আজি সেই বিশ্ব-পতি-যুগল চরণে,
করিছি প্রার্থনা আমি কায়মনো প্রাণে—
লভ সুখ, লভ শান্তি,
লভ নিত্য হর্ষ প্রীতি,
উঠুক্ জয়ের ধ্বনি, হাসুক মেদিনী—
অজর অমর হোক্ তোমার জীবনী!
বাজুক দিগন্তব্যাপি বিজয়-বাজনা,
অক্ষয় অমর হোক্ তোমার মহিমা!! ৪।

কুমারী প্রেমকুসুম নাগ।

মিনতি।

শ্মশান গো! খুলে দাও
নিরুদ্ধ দুয়ার,
একবার দেখে যাই
দাদারে আমার। ১।
সে যে আমাদের ছেড়ে
তব স্নিগ্ধ কোলে
অনন্ত শান্তির আশে
গিয়াছে মা! চলে? ২।
সে যে ছিল আমাদের
সাধনার ধন,
তুমি তো নিয়েছ তারে
করিও যতন। ৩।
নীরবে সমাধি পাশে
আসিব যখন,
জননি গো! দেখাইও
তাহারে তখন।
ফিরে যাই আজি তবে
লয়ে শ্রান্ত মন,
রেখ মা! যতন করি
দরিদ্রের ধন।
সুদূরে ধ্বনিছে ওই
গীতি মলয়ের,
সে ছিল দেবতা, সে যে
নহে মরতের!! ৪।

শ্রীপ্রিয়বালা রায়।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীনগেন্দ্র কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 581. January, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

৪৯ বর্ষ। ৫৮১ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩১৮। | ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—অযোধ্যার খাজুরগাঁওএর রাজা রাণা সার শিওরাজ সিং, কে, সি, এস, আই, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান অতীব প্রশংসনীয়।

মৃত্যু—মহীশূর (Mysore) রাজ্যের দেওয়ান সার কৃষ্ণমূর্ত্তি পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। শাসনকার্য্যে ইনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

মাদক বিষয়ক প্রশ্ন—শুনা যায়, বিলাতে পার্লামেণ্ট সভার গত অধিবেশন-কালে অন্যতম মাননীয় সদস্য সার জন্ রবার্টস্ না কি ভারতে মাদক দ্রব্যের অতিশয় প্রচলন ও তৎপ্রতিকারমূলক কতিপয় প্রশ্ন করেন। ইহার উত্তরে সহকারী ভারত-সচিব মণ্টেস্ বাহাদুর না কি বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ইহার সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছেন। ছোট লাট ও গবর্ণর এ সম্বন্ধে যিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, সেইরূপ করিবেন। এ বিষয়ে ভারত সচিব কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। জন সাধারণের হিতকল্পে যাহাতে মাদক দ্রব্য-সমূহ অনায়াসলভ্য না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীলোকের কাজ।

কোন হিন্দু মহিলা যদি বাল্যকালে বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিখেন, তাহা হইলে ত 'সোনায় সোহাগা' হইবে। উহাদ্বারা তাঁহার শিক্ষাশক্তি ও উপার্জ্জন আপেক্ষাকৃত অধিক হইবারই সম্ভাবনা।

আজ কাল আমাদের দেশের সহর, মফস্বল, সর্ব্বত্রই স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক দেখা যায়। কলিকাতার কলেজে পড়া নব্য যুবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনী-দিগকে শিক্ষিতা দেখিতে যেমন ব্যগ্র, পল্লী-গ্রামের জমিদার বাবুরাও তাহাদের কন্যা, বধূ প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইতে তেমনি উৎসুক। সেই জন্য, হিন্দু মহিলা শিক্ষয়িত্রী হওয়ার উপযুক্ত বিদ্যাবতী ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইলে তাঁহাদের কার্য্যের অভাব থাকিবে না। অবশ্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরে কাজের বেশী সচ্ছলতা, আর উপার্জ্জনও অধিক।

কলিকাতায় কোন গৃহস্থের কন্যা ও বধূকে এক সঙ্গে সপ্তাহে ছ ঘণ্টা পড়াইলে, মাহিনা মাসে ২৲ দুই টাকা, ছয় ঘণ্টা ৪৲ চারি টাকা, বার ঘণ্টা ৮৲ আট টাকা। তিন চারি জন একত্র পড়িলে দুই ঘণ্টা ৩৲ তিন টাকা, চারি ঘণ্টা ৫৲ পাঁচ টাকা এবং আট ঘণ্টা ১০৲ দশ টাকা। অবশ্য, লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই, বোনা ইত্যাদি শিখাইলে মাহিনা কিছু বেশী হয়। একজন শিক্ষয়িত্রী রোজ স্বচ্ছন্দে তিনটী পরিবারে ছয় ঘণ্টা শিক্ষা দিতে পারেন। আর তাঁহার যদি ঘর আষ্টেক ছাত্রী থাকে ও সপ্তাহে গড়ে ত্রিশ ঘণ্টা খাটিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মাসে ৪০৲ চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। উহা হইতে পাল্কী-খরচ ১০৲ দশ টাকা বাদ দিলেও তাঁর আসল আয় ৩০৲ টাকা রহিল। বর্ত্তমান হিন্দু মহিলাদিগের পক্ষে মাসে ২০৲।২৫৲ টাকা উপার্জ্জনই যথেষ্ট বোধ হইবে। কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ছাত্রীদের বয়স ও বিদ্যা বুঝিয়া নিজ জ্ঞান ও বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

যদি তুমি উহাতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে ঐ গুরু কার্য্যের দায়িত্ব লইও না। কিছু দিনের পর উহাতে অক্ষম বলিয়া লজ্জিত ও কার্য্যচ্যুত হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রথম হইতেই নিজ সাধ্যাতীত কাজে না যাওয়া বুদ্ধিমতীর কাজ। বিশেষ, দুএকটী পরিবারে প্রথমে মনের মত শিক্ষা দিতে পারিলে তাঁহাদের অনু-রোধে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কাজ পাইবারও অনেক সম্ভাবনা আছে।

স্ত্রীলোকেরা উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইলে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর কাজ ব্যতীত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যেও তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারেন। অবশ্য উহার জন্য প্রথমে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক শিক্ষা ও পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ইহা সকলের মনে রাখা উচিত যে বিনা জ্ঞান-